সোনার মলাট তারাশঙ্কর

সম্পাদনা

শ্যামল চক্রবর্তী

রামায়ণী প্রকাশ ভবন
১০৬/১, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
১৯শে জুলাই, ১৯৬০

প্রকাশক :
শ্রীমতী শান্তি সান্যাল
১০৬/১ আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
'শঙ্কর প্রিণ্টার্স'
২৭/৩ বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৬

স্কেচ্ ও প্রচ্ছদ-শিল্পী :
চারু খান

দাম : সাত টাকা

ব্লক করেছেন :
ব্লক সার্ভিস

পরিবেশক :
স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স কনসার্ন
৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯।

উৎসর্গ—

যাঁর ইচ্ছা ও সহযোগিতায় এই গ্রন্থ

বন্ধুবর অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে—

—সূচীপত্র—

কবিতা

গল্প

গান

আলোচনা

—:০:—

সংকলন সম্পর্কে······

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথা সাহিত্যের সব্যসাচী লেখক ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি কবিতা লিখেছেন, রাজনীতি বা স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তও ছিলেন। তারপর তিনি এলেন গদ্যসাহিত্যে। গল্প ও উপন্যাস রচনায় তাঁর অসাধারণ মনীষা, বাংলা সাহিত্যে অচিরেই প্রথম সারিব আসন নির্দিষ্ট কবে দিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রেব পর অনায়াসে তারাশঙ্কর নিজের লেখনীর গুণে বাংলা সাহিত্যেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকরূপে আবির্ভূত হলেন। দীর্ঘ জীবনে তিনি সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই বিচবণ কবেছেন এবং গল্প ও উপন্যাসেব ক্ষেত্রে ছিলেন অদ্বিতীয়। বাংলা কথা সাহিত্য তাঁর লেখনীর দ্বারা পরিপুষ্ট স্বাস্থ্য ও আনন্দ লাভ কবেছে এবং আগামীদিনেও তারাশঙ্করেব বচনা আমাদের নতুন পথ দেখাবে।

তারাশঙ্করের পঁচাত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে এই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থে লেখকের নিজের কথা, গল্প, গান, কবিতা এবং তাঁর উপন্যাসের আলোচনা একত্রিত কর হয়েছে। তারাশঙ্করের রচনাগুলি সনৎদা বিশেষ স্নেহের সঙ্গে সংকলিত করার অনুমতি দিয়েছেন এবং তাঁর সহযোগিতার জন্য এই সংকলন গ্রন্থটির প্রকাশ সম্ভব হল। আমি সনৎদার কাছে এ-জন্য চিরদিন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়ে রইলাম। উপন্যাসগুলির আলোচনার জন্য শ্রদ্ধেয় জগদীশ ভট্টাচার্য, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, সুশীল গুপ্ত, শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এবং বন্ধুবর

বার্ণিক রায়ের কাছে ঋণী। তারাশঙ্করের কবি-প্রতিভার আলোচনা করেছেন বিশু মুখোপাধ্যায় এবং ছবি বিষয়ে লিখেছেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। তাঁদের দুজনের কাছেও সমভাবে ঋণী। গ্রন্থটির শেষে লেখক তারাশঙ্করের জীবনপঞ্জীর সঙ্গে তাঁর রচিত রচনার তালিকা ও প্রকাশের সময় সহ পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে দিয়েছি। এই বিষয়ে সনৎকুমার গুপ্তের সাহায্য আমি নিয়েছি। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই স্বর্গত শ্রদ্ধেয় লেখকের প্রতি সম্মান ও প্রণাম জানানোর আকাঙ্খায় এই সংকলন গ্রন্থ পাঠক-সমাজের নিকট উপস্থিত করলাম। এই গ্রন্থটির নামকরণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বন্ধুবর অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, এর জন্য তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। সাহিত্যের পাঠকের নিকট বইটির আদর হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত

শ্যামল চক্রবর্তী

আমার কথা

'আমার সাহিত্যজীবন' দ্বিতীয় খণ্ডে স্বাধীনতার পরের কিছুকাল পর্যন্ত মোটামুটি ঘটনাগুলি লিখেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার দিন পর্যন্তই এসে ছেদ টেনেছি জীবনকথায়। এই কারণে বলছি যে, আজও স্পষ্ট মনে আছে সে সময়ের কথা এবং আমার রচনার মধ্যেও এর পরিচয় আছে 'কালান্তরে'। 'কালান্তর' 'শনিবারের চিঠি'তেই দীর্ঘদিন ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। সে কথায় পরে আসব। সেদিন অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ সনের পরই মন, এবং বলতে গেলে আমার জীবনেরই যেন সব প্রেরণা, সবকিছু পাওয়ার একটি তৃপ্তির মধ্যে সূর্যোদয়ে প্রদীপশিখার মত আপনা থেকেই নিভে গিয়েছিল কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে। উপমাটি বাস্তব দুনিয়ায় সার্থক নয়। কারণ প্রদীপে তেল সলতে থাকলে তার শিখা সূর্যোদয় হলে নিভে যায় না, নিষ্প্রভ হয়েও জ্বলে। মানুষ তাকে প্রয়োজন নেই বলে নিভিয়ে দেয়। কিন্তু যে আগুন বা শিখা চৈতন্যময়, রাত্রিকালে রাত্রির তপস্যায় যা হোমাগ্নি তা প্রভাত হলেই আপন চৈতন্যবশেই প্রসন্ন প্রশান্তির মধ্যে সম্বৃত হয় আপনা থেকেই। রাত্রি

আলোকের অমৃতে দিনের অঙ্গে লীন হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় প্রশ্ন করেছিলেন—"রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?"

বাল্যকাল থেকে কবিতা লিখে সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলাম। কিন্তু যৌবনের কিছু আগেই জীবনের সব কামনা একত্রীভূত হয়ে পরাধীনতার অবসান করে দেশকে স্বাধীন করবার যে জীবনযজ্ঞ তাতেই আহুতি দিয়েছিলাম। সে যজ্ঞের আগুন নিয়ে নিজের বুকে জ্বালিয়ে নিয়েছিলাম। আমার জীবনের সব উপাদান সমিধ্ হয়ে ওই হোমবহ্নিকেই প্রজ্বলিত রেখেছিল আমার মধ্যে। ১৯১৭ সনে অন্তরীণ হওয়া থেকে ১৯৩০ সনে জেলে যাওয়া অবধি বিভিন্ন সময়ে ও ক্ষেত্রে দেশের স্বাধীনতাকামী আত্মত্যাগী সৈনিকের মধ্যে দলগত বিরোধের যে মর্মান্তিক সংঘাত দেখেছিলাম, তাতে বেদনা হয়েছিল যেমন মর্মান্তিক, রাজনৈতিক দলবাদের প্রতি বিতৃষ্ণাও হয়েছিল তেমনি বা ততোধিক মর্মান্তিক। তারই জন্য '৩১ সনে যেদিন আমি মুক্তি পাই, সেদিন রাজনৈতিক বন্দীদের বিদায়সভায় তাঁরা যখন বলেছিলেন 'পুনরাগমনায় চ।' (এই কথাটিই বলেছিলেন বীরভূমের কংগ্রেস সভাপতি আদর্শ অহিংসাপন্থী গান্ধীবাদী নেতা ৺শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডাক্তার মশায়) তখন আমি উত্তরে বলেছিলাম, 'এই আন্দোলনের পথ থেকে আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। এ পথে নয়—আমি সাহিত্যের পথে এই যুদ্ধ আর মাতৃভূমির সেবা করে যাব।' এবং ১৯৩২ সন থেকে সাহিত্যের পথে পা দিয়ে চৈতালী ঘূর্ণি থেকে ধাত্রীদেবতা কালিন্দী গণদেবতা পঞ্চগ্রাম প্রভৃতি রচনার মধ্যে এই স্বাধীনতাযুদ্ধের রূপ ও মহিমাকেই প্রকাশ করেছি। তারই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে আমার জীবনযুদ্ধের জয়কামনার স্বরূপ। এবং সেইটি আমার হয়ে উঠেছিল বেঁচে থাকার লক্ষ্য। দেশের স্বাধীনতা। দেশ স্বাধীন হবে। স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখব। সত্য বলতে এ দেখে যাব,

দেখতে পাব, এমন আশা তো করতে পারি নি। এর জন্য যুদ্ধ করতে করতেই চোখ বুজব এই ধারণাই ছিল। এবং সাহিত্যের ধ্যান এই কামনাকেই আশ্রয় করে আমার ভাগ্যগুণে সরস্বতীর আরতি-প্রদীপ হয়ে উঠেছিল।

তাই স্বাধীনতা আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল কর্ম আমার শেষ। এই তো সব পাওয়া হয়ে গেল।

মনেও হয়েছিল—১৫ই আগস্ট রাত্রি অবসানে প্রভাতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা তুলে সঙ্গে সঙ্গেই যদি আমার শেষ নিশ্বাস পড়ে হৃদ্‌যন্ত্র থেমে যায় আনন্দের আতিশয্যে তবে পৃথিবীর আদ্যন্ত কালের মধ্যে আমার থেকে সুখী এবং বড় ভাগ্যবান আর কেউ থাকবে না।

১৫ই আগস্টের কথা বলবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারছি না। ১৫ই আগস্ট আমি কলকাতায় ছিলাম না। কলকাতার সে সমারোহ, সে বিপুল বিশাল জীবনোচ্ছ্বাস আমি দেখি নি। তার জন্য কোন খেদ নেই আমার।

লাভপুর থেকে আমার ডাক এসেছিল। চিঠি নিয়ে লোক এসেছিল, লোকে চেয়েছিল—'তোমাকে আসতে হবে। লাভপুরে স্বাধীনতার পতাকা তোমাকেই তুলতে হবে।'

আমি লাভপুরের মাটির ডাক শুনেছিলাম। আমার মা লিখেছিলেন চিঠিখানা। আমার পিসীমার কথাও তাতে লেখা ছিল। মায়ের চিঠিতে ছিল—'তোমার পিসীমার এবং আমার ইহা একান্ত ইচ্ছা।'

আমার ধাত্রীদেবতায় পিসীমাই আমার ধাত্রীদেবতা।

মাটির ভূমির যেমন তৃপ্তি আপন বক্ষের শস্যে, অন্নে, জলে, বাতাসের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে মানুষকে পুষ্ট করার, তেমনি আরও একটি গভীরতর তৃপ্তি এই মাটির আছে, সেটি ওই মাটির বুকের সমাজের সংস্কার সংস্কৃতি থেকে সন্তানের মনটিকে পুষ্ট করবার।

লাভপুরে আমার জীবন কেটেছিল, এক নাগাড় বিয়াল্লিশ বৎসর পর্যন্ত। এখানেই এই মনটি পেয়েছিলাম। আমার মনের সৎ অসৎ বিচারের যে ধারাটি তার দিক্‌নির্ণয় করে দিয়েছে—এই লাভপুরের মৃত্তিকা, লাভপুরের সমাজ।

আজও মনে করতে পারি এই স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৯১৮ থেকে ১৯৪০ সন পর্যন্ত বারবার নানান দিক থেকে নানান বাধা এসেছে।

স্ত্রীর সজলকাতর দৃষ্টি তাঁর লুকোবার চেষ্টা সত্ত্বেও চোখে পড়েছে। তাঁর দশ বছর বয়সে আমার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। একান্ত বাল্যকালে মাতৃহীনা হয়েছিলেন। বাপ আবার বিবাহও করেছিলেন, এবং মদ্যপানে প্রায় আত্মহত্যাই করেছিলেন। সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে কোন সংশ্রবই ছিল না। মাতামহীর কাছে মানুষ হয়েছিলেন। বিবাহের পর মাতামহীর স্নেহ এবং আমার প্রতি আকর্ষণে লেগেছিল সে প্রবল দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্ব অবসানে প্রথম যৌবন—চোদ্দ বছর বয়স থেকে একমাত্র আমিই তাঁর আশ্রয়। আমার জীবনের আদর্শকে অস্বীকার তিনি করেন নি কোনদিন, কিন্তু আমি নির্যাতন ভোগ করব, আমি জেলে চলে যাব, এ কল্পনায় অশ্রুবিসর্জনকে সম্বরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি।

শ্বশুরকুল এবং অন্যান্য দিক থেকে বাধা এসেছে। ভীতিপ্রদর্শন এসেছে। প্রলোভন এসেছে সরকার তরফ থেকে।

এর মধ্যে ভাবতে ভাবতে আমার বারবার মনে হয়েছে লাভপুরের কথা—১৯৩০ সনের কথাই বলি। মনে হয়েছিল, সব গ্রামে পতাকা উঠবে, স্বাধীনতার সংকল্প পাঠ করা হবে, শুধু আমার লাভপুরেই হবে না? লজ্জায় মাথা হেঁট হবে লাভপুরের? এমন নানান ঘটনা বারবার ঘটেছে।

তাই আজ এই পরিণত বয়সে, বস্তুবাদীর মত মাটিকে মাটি, পায়ের তলার কঠিন জড়বস্তুস্তূপ বলে ভাবতে চেষ্টা করেও তা পারছি নে। মানবমনের যে চৈতন্য দেশভেদে, গ্রামভেদে, বিশেষ বর্ণে, বিশেষ ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়, তা মাত্র সমাজ ও শিক্ষার প্রভাবেই হয়—তা হয় না। তার মধ্যে ভূমি এবং প্রকৃতিরও প্রভাব আছে। রাঢ় অঞ্চলের মাটি ও প্রকৃতির প্রভাবে মানব প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য, সজল-কোমল নদীবহুল পূর্ববঙ্গের মানবপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য তা থেকে পৃথক।

ও আলোচনা থাক্। এটি আমার ধারণা। ভ্রান্ত হলেও সে ভ্রান্তি আমার সেই তিনি, যিনি 'যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা'—তাঁকে আমি নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনম বলে জীবনের পালা শেষ করে যাব।

যাই হোক, ১৫ই আগস্ট আমি কলকাতার মহাসমারোহ ছেড়ে লাভপুরেই গিয়েছিলাম। আমি সেখানে স্বাধীনতার পতাকা তুলব। আমিই প্রথম ধ্বনি দেব—বন্দেমাতরম! স্বাধীন ভারত কী জয়!

লাভপুর যেতে হলে আমদপুর স্টেশনে নেমে ছোট লাইনে চাপতে হয়, ছটো স্টেশন পর লাভপুর, সাত মাইল পথ। বিকেল ছটায় নামবার কথা, লেট হয়ে গেল, সাতটায় ছোট লাইনের ট্রেন চলে গেছে। কিন্তু আমার জন্য ট্রলির ব্যবস্থা হয়েছে। সে ট্রলিতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা বাঁধা এবং ফুল পাতা দিয়ে সাজানো। রেলের কর্মীরা সে ব্যবস্থা করেছেন।

সেদিনের ধরণীর রূপ যেন স্বতন্ত্র ছিল। আজও তা মনে পড়ছে।

প্রতীক্ষায় অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন আমার বেয়াই ৺নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মশায়। আমার

বড় জামাই ৺শান্তিশঙ্করের পিতা। সত্য বলতে এই নিত্যগোপাল-বাবুই আমাদের গ্রামে দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা-কামনা বহন করে আনার অগ্রদূত। জীবনে ভগবানের অজস্র দানে ধন্য মানুষ। নেতৃত্বের জন্য তিনি নির্দিষ্ট ছিলেন। সাড়ে ছ ফুট লম্বা মানুষ, গৌর বর্ণ, মেদহীন বলিষ্ঠ শরীর, অপরূপ সুকণ্ঠ গায়ক, সঙ্গীত ও কাব্য রচনায় অসাধারণ শক্তি, তেজস্বী মানুষ ছিলেন নিত্যগোপালবাবু। অসাধারণ সম্ভাবনা ছিল এই মানুষটির। কিন্তু বিচিত্র কর্মচক্রে মানুষটি ব্যর্থ হয়ে গেছেন জীবনে। প্রথম জীবনে বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবকটি ১৯০৫ সনে আমাদের গ্রামে রাখীবন্ধন উৎসবের দিনে যে দেশমাতৃকাবন্দনা সংকীর্তনের দল বের হয়েছিল, তাতে নেতৃত্ব করেছিলেন। সে ছবি আমার মনে ভাসছে। তাই বলছি, সত্য বলতে তিনিই আমাদের লাভপুরের এ যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত। কিন্তু কর্মচক্রে। তাঁর এক শিক্ষকের কন্যাকে (শিক্ষকটি তখন মৃত, তাঁর মৃত্যুকালে তিনি তাঁর কুমারী কন্যার চিন্তা থেকে নিশ্চিন্ত করেছিলেন তাকে বিবাহ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে) সংসারের অমতে বিবাহ করে সংসার থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং বাধ্য হয়ে চাকরি নিয়েছিলেন পুলিস বিভাগে। সেখানে কর্তব্যনিষ্ঠ সাধু সৎ কর্মচারী হিসাবে খ্যাতি ছিল তাঁর। কিন্তু বারবার ছুটি নিয়েছেন, চাকরি ছেড়েছেন, আবার সততা ও খ্যাতির জন্য চাকরি পেয়েছেন। চেয়েছিলেন তিনি সাহিত্যিক হতে, দেশকর্মী দেশনেতা হতে, কিন্তু এর জন্য তাও হয় নি। আবার চাকরিতে শেষজীবনে কিছু দিনের জন্যে অস্থায়ী ডি. এস. পি. হয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তিনিই আমাকে প্রথম অভ্যর্থনা করেছিলেন বুকে জড়িয়ে ধরে। বলেছিলেন, তুমি আজ লাভপুরে না এলে চলে? মা যে ম্লান হয়ে যাবেন মনে মনে। লাভপুরের স্বাধীনতা উৎসব যে সার্থক হবে না।

পূর্ণাহুতির শিখা অধোমুখী হয়ে যাবে।

মনে পড়ছে, মধ্যরাত্রি—বারোটার সময় ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি হতে লাগল। ছাদের উপরে বসেছিলাম। আকাশ স্পর্শ করেছিল সে শঙ্খধ্বনি। তার আগে—রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সাড়া পাচ্ছিলাম এ ওকে ডাকছে, ও তাকে ডাকছে।

প্রশ্ন এক—কটা বাজল? আমার ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা। দেখ তো তোমার ঘড়িটা? মানুষের সে অধীরতা সেই আধঘণ্টা মত সময়ের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে আমার মনের মধ্যে। জবাবে একজন বলেছিল, ভাবছ কেন, রেডিয়ো খোলা আছে, ঠিক সময় বারোটা বাজা শুনতে পাওয়া যাবে।

বারোটার সময় বোম বাজি ফাটবার শব্দ হয়েছিল। সে অনেক-গুলো। পরপর ফেটে চলেছিল—বায়ুস্তরে সে শব্দের আঘাতে যে কম্পনতরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল, তা আজও আমি শুনতে পাই। তার সঙ্গে শঙ্খধ্বনি। ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি বলতে গেলে।

দরিদ্র নিরক্ষর ব্রাত্য যারা তাদের ঘরে শঙ্খ ছিল না—সম্ভবতঃ স্বাধীনতার সম্যক অর্থ তারা বোঝে নি, তবুও তাদের বুকে ওই আনন্দতরঙ্গের ঢেউ লেগেছিল—তারাও জেগেছিল।

আমার 'কালান্তর' উপন্যাসের নায়ক সে একরকম আমই। অনেকটা গরমিল, সাজিয়ে গুছিয়ে করলেও তার আত্মা আমারই আত্মা, সে সুদীর্ঘকাল পর ফিরে এসেছে তার গ্রামে। এই গ্রাম থেকে একদা সে দেশকে ভালবাসার অপরাধেই চলে গিয়েছিল।

শুধু রাজশক্তির অত্যাচারেই নয়, এই গ্রামের যারা ধনী, জমিদার, ইংরেজ সাম্রাজ্যের পোষক, তাদের চক্রান্তেও বটে। দীর্ঘদিনে সে জীবনসাধনায় সার্থক হয়েছে—সে এখন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক; তার সাহিত্য এই স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে মানুষের জীবনসঙ্গীত;

সে সাহিত্য দেশের অন্তর জয় করেছে, স্পর্শ করেছে, এতকাল পরে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট সে ফিরে আসছে তার গ্রামে।

'কালান্তরে'র কিছুটা তুলে দিই।—

"থাক। এখন সকল কালের কথা থাক। নূতন কালের প্রথম প্রভাত। ১৩৫৪ সালের শ্রাবণ মাসে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটছে। স্বাধীন দেশের আকাশে প্রথম সূর্যোদয়। পাখীরা ঘন ঘন কলধ্বনি তুলছে। দুটো চারটে কাক উড়ে এসে চালে বসছে। একটা দুটো কোকিল ঘন বিন্যাসে কুহুধ্বনি দিয়ে উড়ে চলে গেল। সে দৃষ্টি ফিরিয়ে আকাশের দিকে তাকালে।

... ...

হঠাৎ কার গানের সুর তার কানে এসে পৌঁছল। উৎকর্ণ হয়ে সে দাঁড়িয়ে গেল।

প্রলয়পয়োধি জলে ধৃত বানসি বেদং
বিহিত বিচিত্র চরিত্র খেদং
কেশবধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে।

একখানি একতলা বাড়ীর ভিতর থেকে গান ভেসে আসছে। বাড়ীখানি গৌরীকান্তের কাছে নতুন। এ বাড়ী সে দেখে যায় নি। কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনে তার বুঝতে বাকী রইল না কিছু।

কিশোরবাবুর কণ্ঠস্বর। এ বাড়ী তা হলে কিশোরবাবুর। কিশোরবাবুদের পুরনো বাড়ী তার বাড়ীর পাশেই। এ বাড়ী তা হলে কিশোরবাবু নতুন করেছেন।

কিশোরচন্দ্র এককালে ছিলেন নবগ্রামের তরুণ নায়ক।"

কিশোরচন্দ্রই নিত্যগোপালবাবু—যাঁর উল্লেখ করেছি আগে। সেদিন রাত্রে নিত্যগোপালবাবু সত্যই এই গান গেয়েছিলেন। সে

রাত্রে তাঁকে গানে পেয়েছিল। গানে তিনি ছিলেন জন্মগায়ক, একমধুক্ষরা ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি পদাবলী কীর্তন ছাড়া কিছু গাইতেন না। সেদিন সন্ধ্যা থেকে বন্দেমাতরম গান থেকে আরম্ভ করে দেশপ্রেমের গানই গেয়েছিলেন। ভোরবেলা গেয়েছিলেন এই দশ অবতার স্তোত্র। এর মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম—বুঝতে পেরেছিলাম—তিনি আপন অজ্ঞাতসারেই এককালে বহুবার পঠিত আনন্দমঠই আবৃত্তি করছিলেন।

'কালান্তরে' আছে—

"সন্ন্যাসী হয়েছিলেন কিশোরবাবু···বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন নবযুগের মহামন্ত্রে দীক্ষা নিতে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নতুন তন্ত্রে।··· তারপর ফিরে এসেছিলেন সেই তন্ত্রের বাণী বহন করে; এখানে সেই বাণী বিতরণ করতে।

···সে (গৌরীকান্ত) দৃষ্টি ফিরিয়ে আকাশের দিকে তাকালে।

সূর্য উঠছে। স্বাধীন দেশের প্রথম প্রভাতের সূর্য।···আবার একটি গানের সুর কানে এল। অনেকগুলি শিশুকণ্ঠের সমবেত সঙ্গীতের ধ্বনি। পিছনের দিক থেকে আসছে। ফিরে তাকালে গৌরীকান্ত।

ছেলেমেয়েদের, না, শুধু মেয়েদের একটি মিছিল আসছে। তারাই আসছে গান গেয়ে। রবীন্দ্রনাথের গান—

ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়—
তোমারই হউক জয়।

কিশোরী এবং বালিকাদের মিছিল। পরনে বেশীর ভাগ লাল পেড়ে সাদা শাড়ী, সাদা জামা, এলোচুল—সারি বেঁধে গান গেয়ে এই দিকেই আসছে। চমৎকার লাগছে। স্বাধীনতার নববর্ষে এই মিছিল একটা নতুন ইঙ্গিত নিয়ে আসছে যেন।···নূতনের ধারা,

নূতনের বাণী, নূতনের কল্যাণ, নূতনের অভিশাপ, নূতনের উন্মত্ততা —ভালোমন্দ দুই এসেছে।...”

*　　　*　　　*

‘কালান্তরে’র এটুকুর মধ্যে সেদিনের প্রত্যক্ষ বাস্তব লিপিবদ্ধ করেছিলাম। এ কথা এমন করে বিশদভাবে বলবার একটি বিশেষ কারণ আছে। আগেই বলেছি, মনে হয়েছিল কর্ম শেষ। জীবনযজ্ঞে পূর্ণাহুতি পড়ে স্বাধীনতার চরু উঠল, আজ মৃত্যু হলে সে মৃত্যু হবে অমৃতের সোপান। সব কাজ যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল, সব কথা যেন হারিয়ে গিয়েছিল।

কথাটার অর্থ খুব ব্যাপক।

সেদিন সাহিত্যে চিন্তায় কর্মে ঠিক এমনই হয়েছিল। একটা ছেদ পড়ে সব সূত্র হারিয়ে যায় নি, ফুরিয়ে গিয়েছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’, রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’, শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’, আমার ‘ধাত্রীদেবতা,’ ‘কালিন্দী’,‘গণদেবতা’, ‘পঞ্চগ্রাম’ ধরে সাহিত্যের যে ধারাটি ভাগীরথীর ধারার মত অভিশপ্ত সগর-সন্তানদের মুক্তির জন্যই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বিশেষ পথ ধরে চলেছিল, সগর-সন্তানদের উদ্ধারের পর সেই খাতে জলধারা বইবার আর প্রয়োজন রইল না। তার মুখে ছাপঘাটির মজে-আসা মোহনার মত চড়া পড়ে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে স্বাধীনতার কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির মধ্যে পরাধীনতার বেদনা, স্বাধীনতার কামনা যে স্বাভাবিক ভাবেই শক্তি ও প্রেরণার বড় একটি উৎস এ তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে সব সাহিত্যিকই সেদিন নতুন দিগন্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। তার মধ্যে আমার অবস্থা সেদিন সর্বাপেক্ষা সঙ্গিন।

আমার যেন মনে হয়েছিল, আমার কাজ ফুরিয়েছে। জীবনে বেদনার ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়েছে। যারা হাসির কথা বলে, তাদের কথা আলাদা। আসল যে আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে সনাতন ধারায় ক্ষণে ক্ষণে বিকশিত হচ্ছে, তা নিয়ে যারা লেখে তারা আলাদা। আমি শেষ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনুরূপ ইতিহাস যে সব দেশের, সে সব দেশেও সম্ভবতঃ জীবনক্ষেত্রে, সাহিত্যক্ষেত্রে ঠিক একই অবস্থা ঘটেছে ইতিহাসে। ঘটাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশে সেদিনের অর্থাৎ ১৯৪৭ সন থেকে কয়েক বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এই সত্যই প্রমাণিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

অন্যের কথা বলতে পারব না, আমার নিজের পক্ষে এ কথা সত্য। আমার সাহিত্যজীবনে যে একটি তপস্যার ধারা ছিল, দেশের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তার ধারায় ছেদ পড়ল। রইল যেটা, সেটা নিত্যকর্মপদ্ধতি মতে আচার-আচরণ পালনের মত কিছু।

আর দুটি ধারা ছিল। সে দুটি দেশে ও সমাজে কিছু কিছু অংশে প্রবহমান থাকলেও তা সাহিত্যিকেরা গ্রহণ করতে পারেন নি, সাহিত্যক্ষেত্রেও গতিবেগ বিস্তার করতে পারে নি।

একটি মার্ক্সইজমের ধারা। অপরটি এদেশে ইতিহাসের সনাতন সংস্কারের ধারা। স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতেই দেশ সকল দুঃখ, সকল অভিশাপ, সকল বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছিল এ কথা কেউ বলবে না। দেশে তখন অপরিসীম দারিদ্র্য, সহস্র শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজ, কালোবাজারের কৃষ্ণরাত্রির ঘনান্ধকার প্রভৃতির অবসান স্বাধীনতার সূর্যোদয়েও হটাতে পারে নি।

নূতন সমাজ নূতন দিন তখনও বহু দূরে। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় মার্ক্সইজমের প্রধান ধ্বজাবাহী কম্যুনিস্ট পার্টির আচরণ সমস্ত

দেশ ও সমাজের মনকে বিমুখ করে তুলেছিল সেদিন। আমার মন প্রচণ্ড বিমুখিনতায় বিমুখ হয়েছিল তাঁদের প্রতি। তার কারণ আমি তাঁদের অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে দু-তিন বৎসর সংশ্রবে থেকে, এদের স্বরূপ দেখে ও বুঝে, হতাশা ও বিতৃষ্ণায় মর্মান্তিক পীড়ায় পীড়িত হয়েছিলাম। কেবলমাত্র আমার যে সত্যবোধে আমি বারবার জীবনের ভুল বুঝবামাত্র ঘোষণা করে সংশোধন করেছি, সেই শক্তিবলেই তাদের থেকে পৃথক হয়ে সরে এসে আবার যাত্রাপথে নূতন যাত্রা শুরু করতে পেরেছিলাম। অথচ কম্যুনিস্ট পার্টির ভুল বা ভ্রান্তি যাই হয়ে থাক্, তাতে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ গঠনের আদর্শ ও লক্ষ্য মিথ্যা হয়ে যায় নি। সেদিন এই আদর্শ এবং লক্ষ্যই সাহিত্যের এই ধারার পথে নূতন দিগন্তের ইশারা দিতে পারত। কিন্তু সেদিন মানুষের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে সাহিত্যিকেরা (অবশ্য কতিপয় পার্টিমেম্বার ছাড়া) এ দিক দিয়ে পিছন ফিরেছিলেন। আমিও পিছন ফিরেছিলাম। সব থেকে মানুষকে তাঁরা 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' ধ্বনিতে তাঁদের প্রতি এবং তাঁদের ইজমের প্রতি বেশী বিমুখ করে তুলেছিলেন।

আর একটি প্রবাহ ছিল, সেটি ইতিহাসের সনাতন সংস্কার-ধারার প্রবাহ। সেই ধারাতেই দেশ অনিবার্যরূপে বিভক্ত হয়েছিল। দেশে আত্মঘাতী কলহের শেষ ছিল না, রক্তে দেশ ভেসে গিয়েছিল। দ্বিখণ্ডিত বাংলাদেশের আর্তনাদ আকাশ স্পর্শ করেছিল। শুধু তাতেই শেষ নয়, তার চরম পরিণতি ঘটেছিল ১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারি শুক্রবার, অপরাহ্ণে।

মহারাষ্ট্র প্রদেশবাসী গোডসে মহাত্মাজীকে হত্যা করেছিল রিভলভারের গুলিতে। এই ঘটনাটির মধ্যেই নিহিত আছে এই যে ধারাটির কথা বলেছি, তার অস্তিত্ব কত প্রবল তার প্রমাণ।

ঘটনাটিকে বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশ এবং পাঞ্জাব এই দুটি প্রদেশ ইতিহাসের কর্মফেরের চক্রে বিভক্ত হয়েছে, এখানেই রক্ত বেশী ঝরেছে, এখানেই নারীর লাঞ্ছনা হয়েছে, কিন্তু গোডসে এ দুই প্রদেশের কেউ নয়। সে জন্মেছিল মহারাষ্ট্রে। সে মারাঠী হিন্দু।

আমার বলবার কথা এই যে, এই যে ধারাটি, জাতীয় ও সামাজিক জীবনে যে ধারা এমন প্রবল তার অস্তিত্ব সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ও বাংলার সমাজ ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করতে পারে নি।

নূতন একটি পথের জন্য, দিগন্তের জন্য সেদিন দেশের দুঃখময় অবস্থা সত্ত্বেও সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতার আনন্দে ক্লান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

কবিতা

নান্নুর পথে

কতদূর কতদূর মধুগীতি ভরপুর
পীরিতি-সায়র-তীরে মধুর নান্নুর !
প্রখর ভানুর করে রবি-তপ্ত এ প্রান্তরে
ঝঙ্কৃত কতদূরে ব্রজবেণু সুর !
ওগো, আর কতদূর !
আবরিয়া দিক্-রেখা বনরাজি লীলা-লেখা
ওই কি যেতেছে দেখা প্রেম পূত পুর !
কিশলয়ে শোভাময় দোলে তরুশিরচয়
সঙ্কেতে বুঝি বা কয়—হেথায় নান্নুর।
ওগো, আর কতদূর !

"রাখাল, জান কি তুমি চণ্ডীদাসের ভূমি
মধুপুর নান্নুর আর কত দূর ?"
রাখাল কহিল হেসে "এসেছ পথের শেষে
চণ্ডীদাসের দেশে এইত নান্নুর।
ওগো, আর নহে দূর॥"

'শোন ভাই, শোন ভাই— এখানে কি শোনা যায়
প্রাণগলা মনভোলা মধুঢালা সুর ?'
কহিল সে 'শুনি নাই' প্রাণ করে হায় হায়
দেবীহারা বেদীকার পারা এ নান্নুর।
ওগো, এসে এতদূর!

রাখাল চলিয়া যায় একি সুর! ও কি গায়
'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম সুর।'
কাণের ভিতর দিয়া পশিয়া ভরিছে হিয়া
গীতিহারা নয় এ যে গীতিভরা পুর॥
ওগো এসেছি নান্নুর—
ওই—ওই সেই সুর॥

[এই কবিতাটি বীরভূম সাহিত্য সম্মেলন (১৩৩০) উপলক্ষে রচিত। কবিতাটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আষাঢ় ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং সকলেই এই কবিতাটিকে লেখকের প্রথম রচনা বলে বলছেন। কিন্তু, অন্য একটি কবিতা পাওয়া গেছে যা 'সচিত্র শিশির' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির নাম 'ঢেউ'। সেই কবিতাটি এই গ্রন্থের শেষে 'জীবন পঞ্জিকায়' অন্তর্ভুক্ত করা হল।]

আগমনী

গড়িয়া মাটির মূর্তি অন্তরের আকুল আহ্বানে
আদি জননীরে ডাকি।
কে আদি জননী কেহ আছে কিনা তাই কেবা জানে?
তবু ডেকে থাকি।
মনে করি মা এসেছে, মনে মনে ঘর ভরে ওঠে
বাহিরে সোনার রোদে পুকুরে শালুক পদ্ম ফোটে।
ধানে ধানে ভরা মাঠ
জলেতে পিছল ঘাট
নালা ও নদীর ধারে হাল্কা সাদা বনফুল দোলে।
তরুণী মেয়েরা সব হাসিমুখে ছেলে কোলে
আজিকে বাপের বাড়ী চলে।
আকাশ কি ঝলমল
চলেছে মেয়ের দল
কি শুভ্র উজ্জ্বল মেঘ—দলে দলে চলেছে উত্তরে।
ঘরের অঙিনাখানি আলো করে থরে থরে
শিউলির ফুল ঝরে পড়ে।
এ শরতে বাংলা দেশে অন্তরের আকুল আহ্বানে
পৃথিবীর আদিমাতা, তুমি এস আমাদেরই প্রণীত বিধানে।

তারাশঙ্কর নিজের লেখার টেবিলে।

এই ঘরে বসেই তিনি লিখতেন। লেখার টেবিলটি সামনে রয়েছে।

লেখকের জন্মদিনে উপস্থিত নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু ও তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী রবীন্দ্রলাল সিংহকে দেখা যাচ্ছে।

তারাশঙ্করের জন্মদিনে উপস্থিত সাহিত্যিকবৃন্দ। রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর, সমরেশ বসু, মনোজ বসু' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।

নিবেদন

পৃথিবীর গুহাগাত্রে কোন উষাকালে
পাথরের তীক্ষ্ণ কোণে কাটিয়া আঁচড়
ছবি এঁকে রেখে গেছে। কালের কপালে—
এ জীবন বিহঙ্গের—ধারালো নখর
কাটা লিখা। একাল পর্যন্ত সেই থেকে
চলে সেই দাগ টানা ; পৃথিবীর বুক
কালের আঁচড়ে কেটে বীজ দেয় ঢেকে
কৃষকেরা চিরকাল, অন্ন তৃপ্ত সুখ
স্বাস্থ্যের আনন্দ আনে নতুন ফসল
মিষ্টঘ্রাণে বাতাসের সর্বাঙ্গ সুবাস
সবুজ সোনালী রঙে ধরণী উজ্জ্বল।
মানস আনন্দ-ক্ষেত্রে চলে সেই চাষ ;
আজ যারা কলমে আঁচড় টেনে যায়
তারাই ফসল বোনে—তাহাদের পায়
নতি রেখে যাই আমি আমার সন্ধ্যায়—
তোমরা আঁচড় টানো, এ ধরণী আছে প্রতীক্ষায়!

বন্দী প্রতাপাদিত্য

বাংলার সীমা পার হ'য়ে সবে বারাণসীপুর মাঝে—
প্রতাপে বাঁধিয়া মোগল চলেছে,—বিজয় বাদ্য বাজে—
'রোসো রোসো' হাঁকে মানসিং বীর
'এইখানে আজি ফেলহ শিবির,
জয়ের অর্ঘ্য দিব শঙ্করে, প্রতাপ রাজার তাজে'
প্রতাপে বাঁধিয়া থামিল মোগল বারাণসীপুর মাঝে।

বারাণসীপুরে পড়িল বিজয়ী মোগল স্কন্দাবার।
সূর্য তখন রক্ত বরণ চলেছে অস্তপার॥
নটী নিক্কণ শিবিরে ধ্বনিয়া—
আকাশে বাতাসে উঠিল রণিয়া ;
পূরবে তখন বাংলার সীমা ঘেরিছে অন্ধকার।
সেই দিকে চেয়ে কাঁদিছে প্রতাপ, কারার বন্ধ দ্বার॥

মনে হ'ল তার—সন্ধ্যা আঁধার নয়—নয় ইহা স্থির ;—
পরাধীনতার ব্যথিত আঁধারে ম্লান মুখ জননীর।
রুদ্ধ রোষেতে ফুলিয়া ফুলিয়া
বিশাল বক্ষ উঠিল দুলিয়া,—
টগ্‌বগ্‌ করি ফুটিল শোণিত অন্তরে ধমনীর।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ উঠিল বাজিয়া হাতে পায়ে জিঞ্জির॥

হাঁকিল প্রতাপ রায়—

'মা আমার, মা আমার, বিদায় বিদায় পায়।
পিঞ্জরে রুদ্ধ মা জিঞ্জির হাত পায়।
জনমের শোধ আজি ধূলা তোর মাখি গায়।
দস্যু তা দেবে নাক নিরুপায়-নিরুপায়॥'

'আর কেন, ফেরা মাগো, আঁখি তোর সকরুণ
সন্তান বুকে কেন হানো বাজ নিদারুণ!
ব্যর্থ মা উদ্যম, বল নাই কলিজায়,
কোষে নাই তলোয়ার, জিঞ্জির পাঞ্জায়॥'

'মরদরা মরে গেছে, মুর্দায় ভরা দেশ
গৃহকোণে ক্রন্দন সম্বল অবশেষ।
পদলেহী কাঙালী এ বাঙালীরা প্রাণদায়
ইজ্জত্ তুলে দিল মোগলের বান্দায়।'

'পাপ তারা—অভিশাপ, বেইমান্—বেইমান্—
বিধি দেওয়া স্বাধীনতা, বিকাইল সেই দান!
ভগবান, আছ তুমি চিরদিন শুনি তাই,
'থাক যদি,—নাশ করো বেইমানে দুনিয়ায়॥'

'না—না ভুল—ভুল, অভিযোগ কেন আর
পার যদি সোজা ছুরি কলিজায় হানো তার।
ছিঁড়ে তার কল্‌জেটা ছেঁটে পেশো পায় পায়।
মরদ কি বাংলায় কেউ নেই ? হায়—হায় !'

'কেউ যদি বেঁচে নাই, একবার আরবার—
ছিঁড়ে দে রে শৃঙ্খল, ভেঙে দে রে কারা দ্বার।
শোণিতের তাজা স্রোত আজও বুকে বয়ে যায়,—
ভা-ঙ্গ—ভা-ঙ্গ—ও শৃঙ্খল বল আছে পাঞ্জায় ॥'

খান-খান-হয়ে টুটে শৃঙ্খল,—থর—থর—কাঁপে কারা।
থম থম্ করে সন্ধ্যা আঁধার, আকাশে কাঁদিল তারা ॥
উত্তেজনায় চেতনা হারায়ে,
লৌহ-কারার প্রাচীরের গায়ে
প'ড়ে গেল বীর, মস্তক হ'তে ছুটিল শোণিত ধারা।
ক'টি কথা আর কহে শেষ বার, স্তব্ধ ধরণী সারা—

'আসিব মা আরবার, বারবার কোলে তোর,
ছোট দুটি হাত দিয়ে মুছাব মা আঁখি লোর।
ব্যর্থ এ উত্তম—ক্ষোভ নাই—ক্ষোভ নাই ;
মা আমার, মা আমার, বিদায়,—বিদায় পায় ॥

শ্রাবণে

সন্ সন্ সমীরণ
ঝর ঝর বরিষণ
আপন ভোলা।
সখি এ শাঙন ঘন
ঝুলনা ঝোলা॥

ঘন—রঙীন বাসে তনু আবরি বালা।
এস—এলান কেশে দিয়ে ফুলের মালা।
এস যায় যে বেলা।
হিন্দোলে তুলি সই
দোতুল দোলা॥

সখি—কাজরী গাহ আজি সরম মানা
আজি—মদন কালার তরী মরণে হানা॥
আজি বাঁধন ভোলা
তটিনী নটিনী হের
আকুল রোলা॥

ওই—বিজুরি চমকে কে গো নয়না হানে।
সখি—কথা যা, গোপনে লাজে কয়ো না কানে॥
হবে ফুকারি বলা—
আবরণ বরিষণ
বায়ু উতলা॥

সখি—ধৌত গগন তলে নীলিমা গাঢ়—
মরি—নীলাভ আভায় চাঁদ মোহন আরো
করে সমীরে খেলা—
ধরাতে দীঘির বুকে
চাঁদের মালা—
আহা—ছুটিছে মেঘের দল সাদা ও কালো
ছুটি—শ্যামা ও গৌরী মেয়ে ছায়া ও আলো
করে ছুটিয়া খেলা
সখিলো খেলিবি যদি
ঝুলনা ঝোলা ॥
সখি—কদম ফুলের রেণু তনুতে মাখ,
ঘন—মেঘের কাজল কাল নয়নে আঁক,
আছে গাঁথিতে মালা
টগর চামেলী বেলা
যূথিকা তোলা ॥
ওই—ঝরিছে ফটিক জল অঝোর ঝরে।
আন—সজনী লো রজনীগন্ধা ভরে ॥
আজি চুপ কোয়েলা।
প্রিয়া সনে খেলে শাখে
দোদুল দোলা ॥
মরি—ঝর ঝর ঝরে বারি ছন্দ নব।
সখি—বাজিবে তাহার সাথে কাঁকন তব
যত দিবে গো দোলা
সখি এ শাঙন ঘন
ঝুলনা ঝোলা ॥

জন্মান্তর

সাধারণ লোকে বলত খাণ্ডারণী। যারা লেখাপড়া জানে তারা কেউ বলত তুর্গাবতী কেউবা বলত লক্ষ্মীবাঈ। অর্থাৎ ঝাঁন্সীর রাণী —আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নারী বাহিনীর নাম ঝাঁন্সী বাহিনী হওয়া থেকে ওই নামটাই বেশী চলিত হয়েছিল। কিন্তু মু্খের সামনে ওসব বলবার সাহস ছিল না কারুর। নিঃসন্তান বাল্যবিধবা এই মেয়েটি যেন আগুনের মতই সারা জীবন জ্বলছে। এবং অনির্বাণ জ্বলবার পক্ষে সবচেয়ে বড় সুবিধা করে দিয়েছিল তার ভাগ্য। হোমকুণ্ডে অগ্নিস্থাপনের মত তাকে বিবাহ সূত্রে চিতুরার চাটুজ্জেদের বাড়ীতে এনে ফেলেছিল। ছোট গ্রাম চিতুরা, বলরাম চাটুজ্জে চাটুজ্জে-বাড়ীর একমাত্র মালিক। সেকালে অবস্থাপন্ন ঘর বলতে যা বোঝায় তাই ছিল চাটুজ্জে বাড়ী। চিতুরা গ্রাম খানার জমিদার, সত্ত্বে অর্ধেকের অধিকারী, বাগান পুকুর খেত খামার, লোকে বলত

দুধে ভাতে অবস্থা। চিতুরা গ্রামের আয় মাত্র হাজার টাকা। তারই অর্ধেক। কিন্তু সেকালে ধান চাল মাছ দুধের সঙ্গে পাঁচশো টাকা কম কি ছিল! বাড়ীতে নারায়ণ শিলার সেবা; একাধারে লক্ষ্মী-নারায়ণ ঘরে বাঁধা। বলরাম চাটুজ্জে নিজেও ছিলেন যেমন গোঁড়া ব্রাহ্মণ তেমনি ছিলেন প্রতাপান্বিত গ্রাম-শাসক; জমিদারীর অহঙ্কারও কম ছিল না।

জীবনে পরের মাটিতে পা দেন নি। গ্রাম ছিল তাঁর জমিদারী। সব মাটিই তাঁর। গ্রাম থেকে বের হয়ে সরকারী সড়ক ধরে চলতেন। সরকারী সড়ক পরের মাটি নয়। গ্রামের বাইরে কোন পায়ে হাঁটা পথ দিয়ে কোন দিন তিনি হাঁটেন নি। হৈমবতী বলরাম চাটুজ্জের দ্বিতীয় পক্ষের নিঃসন্তান পত্নী। স্বামীর স্বভাব এবং সম্পত্তিতে অধিষ্ঠিতা হয়ে হৈমবতী ওই নাম অর্জন করেছেন। খাণ্ডারণী দুর্গাবতী। ঝাঁন্সীর রাণী।

এ-কালের তুখোড় ছেলেরা হৈমবতীর বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় চীৎকার করে উঠত—মেরি ঝাঁন্সী নেহি দুঙ্গা! হৈমবতী সেকালের মেয়ে, ইতিহাস পড়েন নি, মানে বুঝতে পারেন না কিন্তু চীৎকারের মাত্রা একটু বেশী হলেই সাড়া দিয়ে ওঠেন, কে র্যা? কে? কার ছেলে?

কথাটার মানে বুঝলেন ১৩৬১ সালে। জমিদারী লোপ আইন পাশের খবর শুনে হৈমবতী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কথাটা শুনেছেন কিছু দিন থেকেই কিন্তু তাই বলে ঠিক এই সময়েই সেদিন কটা ছেলে সমবেত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, মেরি ঝাঁন্সী নেহি দুঙ্গা! চমকে উঠলেন তিনি। গমস্তা হরিহরকে প্রশ্ন করলেন, কথাটার মানে কি বলতে পার হরিহর? আজ ঠিক এই মুহূর্তে ওদের সমবেত কণ্ঠে উৎসাহিত ধ্বনি শুনে তাঁর সন্দেহ হয়ে গেল—

বোধ করি কথাটার সঙ্গে তাঁর কোথাও কোন এটকা সম্পর্ক সূত্র আছে। কথা কয়টা নিছক ছেলেদের খেয়ালের চীৎকার নয়।

হরিহর মাথা চুলকে বলল—ওসব—শুনবেন না আপনি, কান দেবেন না।

—তা শুনব না। কিন্তু মানেটা বুঝিয়ে দাও দেখি!

মানে না বুঝে তিনি ছাড়লেন না, এবং মানে বুঝে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। হরিহরের ভয় হল হয়তো বা হৈমবতী রাগে চেতনা হারিয়ে পড়ে যাবেন। কিন্তু তা তিনি গেলেন না। কোন রকমে আত্মসম্বরণ করে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কিন্তু বিকেলে নিজে বেরিয়ে ছেলেদের বাপেদের পাড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, শোন্‌তো সব। ইদিকে আয়।

একালে জমিদারের প্রতাপ অনেক দিনই গেছে—কিন্তু হৈমবতীর প্রতাপ যায় না, যাবার নয়। গৌরবর্ণ দীর্ঘাঙ্গী প্রৌঢ়া, চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি, রূঢ় ভাষা—এর প্রতাপ কবে যায় বা যাবে? হৈমবতীর অভিসম্পাত অতি রূঢ়। তাই ছেলেদের অভিভাবকেরা সন্ত্রস্ত হয়েই বললে—আজ্ঞে মা?

—তোরা ভেবেছিস কি?

—আজ্ঞে?

—নালিশ করব আমি গভরমেণ্টের নামে।

—আজ্ঞে?

—ন্যাকা সাজছিস? কিন্তু শোন, সর্বস্ব বিক্রি করে লড়ব। যদি হারি তবে দামোদরকে গলায় ন্যাকড়া জড়িয়ে বেঁধে এখান থেকে চলে যাব।

তা হৈমবতী পারেন। মামলা মকদ্দমা তিনি অনেক করেছেন।

গমস্তা মারফতে নয়, নিজে সদরে গিয়ে উকীলদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের কথা বুঝে নিয়ে তবে তাঁদের ছেড়েছেন এবং নিজের কথা বুঝিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর উইল নিয়ে মস্ত মামলা হয়েছিল। উইল প্রবেট না হলে তাঁকে এ বাড়ী থেকে এক বস্ত্রেই হয়তো বেরিয়ে যেতে হত। মামলা হয়েছিল— বলরাম চাটুজ্জের প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্র হৈমবতীর সতীনের সন্তান নীলুর সঙ্গে। সে অনেক কাণ্ড।

নীলুর জন্যেই বলরাম অনেক দেখে শুনে অনেক মেয়ের মধ্যে পছন্দ করে হৈমবতীকে ঘরে এনেছিলেন। হৈমবতী নিজেও সৎমায়ের হাতে বড হয়েছিল, এমন সৎমা এবং এমন সৎ মেয়ে—এ নাকি সেকালে কেউ দেখে নি। হৈমবতীর নিজের মা ছিল প্রখরা ও মুখরা কিন্তু সৎমা ছিল মধুভাষিনী ; সেকালে হৈমবতীরও মুখে মধু ছিল। নয়নে মধু বচনে মধু রূপে মধু গুণে মধু ছিল হৈমবতীর ভিতরে বাহিরে, সর্বত্র। তিন বছরের মাতৃহীন নীলু সদ্য বিবাহিতা বধূটির কোলে চেপে এক মুহূর্তে মধুর ভাণ্ডারের মক্ষিকার মত জীবনের বাসায় বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা,—পনের বছরের নববধূ হৈমবতী। সেকালের পুণ্যি পুকুর সেঁজুতি ব্রত করা মেয়ে, সৎ মায়ের কল্যাণে পাঠশালাতেও কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। পুতুল খেলায় অভ্যস্ত মেয়ে। একালের মেয়ের তুলনায় অন্য যোগ্যতা কম ছিল, কিন্তু এক মুহূর্তে বাড়ীর গৃহিণী হ'তে এবং নীলুর মা হ'তে যে যোগ্যতা এবং মনের গড়ন দরকার তা তাঁর পূর্ণ মাত্রায় ছিল। তিনিও মেতে উঠেছিলেন নীলুকে নিয়ে। বলরাম চাটুজ্জে খুশী হয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন স্ত্রীকে। বয়সের পার্থক্যে বলরাম বৃদ্ধ স্বামী ছিলেন না। নীলুই তাঁর প্রথম সন্তান। বয়স ছিল তাঁর ত্রিশ। একালের প্রথম পক্ষ পাত্রের বয়স।

কিন্তু মনে মনে ছিলেন পঞ্চাশোর্ধ বয়স্কের মত প্রবীণ। ত্রিশ বছর বয়সেই থান ধুতি পরতেন তিনি। কাজেই তরুণী পত্নীকে সমাদরের পরিবর্তে আশীর্বাদ করতে তাঁর বাধে নি। সেকালের মেয়ে হৈমবতীও অবনত মস্তকে গভীর ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর তরুণ চিত্ত এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি এবং সেই আশীর্বাদকে ফলবতী করে তুলতে চেষ্টার আর ত্রুটি করেন নি! বাপের বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। নীলুকে নিয়েই তিনি বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন। আবদেরে ছেলে ছিল নীলু। তার আবদার এবং হৈমবতীর সেই আবদার রাখার বহর দেখে হৈমবতীর বাপ বলেছিলেন—এতটা ভাল নয় হৈম। তোর নিজের ছেলে হলে তখন কষ্ট পাবি, বলে দিচ্ছি। এত কেন? হৈমবতী বলেছিলেন আশীর্বাদ কর বাবা, ওই আমার কোল জুড়িয়ে থাক, আমি আর ছেলে চাই না।

—কি বললি?

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন বাপ। তারপর বলেছিলেন—ওরে সতীনের ছেলে আর নিমে সমান। ঘি দিয়ে ভাজলেও মিষ্টি হয় না।

এরপর একদিন হৈমের অনুপস্থিতিতে নীলুর দুরন্তপনা দেখে তিনি বলেছিলেন—ওটাকে দেখলে আমার রাগ ধরে। এবং কষে কান দুটিও মলে দিয়েছিলেন। হৈম বাড়ীতে ফিরতেই নীলু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলেছিল—

—দেখ মা, দাদু আমার কান মলে কি রকম ফুলিয়ে দিয়েছে। আর বললে—।

হৈম ঠিক তার পরদিনই গরুর গাড়ী ভাড়া করে নীলুকে নিয়ে চলে এসেছিলেন। আসবার সময় বাপ বলেছিলেন—একটু কান মলে শাসন করেছি আর দুটো কথা বলেছি বলে এত হৈম। কিন্তু ও ছেলের ভবিষ্যতে হবে কি?

বলরামের গৌরবে গৌরবান্বিতা হৈম হেসে বলেছিলেন—কি আর হবে? ওকে তো আর দশজনের মন রেখে চলতে হবে না। ও জমিদারের ছেলে!

সেই নীলু বার বছর বয়সে পড়তে গেল নিজের মামার বাড়ী, শহরে। যাবার সময় হৈমবতী বলেছিলেন—দেখিস বাবা, কথায় আছে সোনায় বাঁধা আগ্‌নে, তাতে বেড়ায় ভাগ্‌নে। মামার বাড়ী গিয়ে মাকে যেন ভুলিস নে।

নীলু বলেছিল—ধেৎ। আমি ওদের বাড়ী থাকবই না। আমি বোর্ডিংয়ে থাকব।

কথা তাই ছিল। বলরামও চান নি যে নীলু মামার বাড়ীতে থাকে। জমিদারের ছেলে, মামাই হোক আর যেই হোক পরের ভাতে পোষ্য হবে কেন? তাছাড়া নীলুর নিজের মামারা পাখা ওঠা পিঁপড়ে। বলরাম তাই বলতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘর; নীলুর মাতামহের পেশা ছিল গুরুগিরি। বলরাম যখন বিবাহ করেছিলেন তখন তাই ছিল। তারপর এক শিষ্যের সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ঠিকাদারী করতে শুরু করে নীলুর মামা অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। পেশাটাই গিরি থেকে দারী বা টারীতে অর্থাৎ গুরুগিরি থেকে ঠিকাদারী বা কণ্ট্রাক্টরী হয়ে দাঁড়াল। একেবারে সেকালের নব্য তান্ত্রিক হলেন। বিয়ের সময় বলরাম শ্যালকদের বলতেন পটো-ঝাড়া বামুন। এখন শ্যালক বলতে লাগলেন—জমিদার না ড্রোন্‌স্। ছেলেকে পড়তে পাঠাবার সময় বলরাম শ্যালককে লিখলেন—"নীলুকে তোমাদের ওখানেই পাঠাইতেছি। সে বোর্ডিংয়েই থাকিবে। তোমরা দেখাশুনা করিবে অন্ততঃ এই ভরসাটুকু করি।'

বলরাম চাটুজ্জে বলতেন—ভুল করেছি। জীবনে ওই একটা ভুল।

বৎসর কয়েক পরেই নীলুর পরিবর্তন দেখা গেল। ধরা পড়ল—সেবার ছুটির সময় বাহির বাড়ীতে নীলুর ঘরে পাখীর মাংসের কুচো হাড় থেকে। তক্তাপোশের তলা পরিষ্কার করতে গিয়ে পেলেন হৈমবতী নিজে। অনেকগুলি হাড়, সরু লম্বা। বৈষ্ণবের বাড়ীতে পাখীর হাড়? কোথা থেকে এল? বলরাম অনুসন্ধান করে বের করলেন—কীর্তি নীলুর। মাহিন্দার গোপাল বাউড়ীর সাহায্যে নীলু গোয়াল বাড়ীতে মুর্গী রান্না করিয়ে রাত্রে ভক্ষণ করে। নীলুকে তিরস্কার করলেন, প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন। নীলু পালাল, গিয়ে হাজির হল মামাবাড়ীতে।

মামা লিখলেন—এ কালে মুর্গী খাওয়ার জন্য মাথা মুড়োনোর ব্যবস্থা দিয়াছেন শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ছেলের মা না থাকিলে এমনই হয়। সৎমা বলিয়াই হাড়গুলি আপনাকে তিনি দেখাইয়াছেন। এখানেই আসিয়াছে, এখানেই থাকিবে। লেখা-পড়া শিখুক, মানুষ হউক—তাহার পর যদি সে সঙ্গত মনে করে তবে প্রায়শ্চিত্তাদি যাহা হয় করিবে।

বলরাম ছিলেন দোর্দণ্ড প্রকৃতির। তিনি নিজে গেলেন শহরে; শ্যালকের বাড়ীর দরজার সামনে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ডেকে বললেন—"বের করে দাও নীলুকে। নইলে আমি থানায় যাব।"

নীলুকে জোর করে নিয়ে এলেন বাড়ী এবং মাথা কামিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তবে ছাড়লেন। এবং হুকুম দিলেন—থাক পড়া এই পর্যন্ত।

হৈমবতী মাঝখানে পড়তে চেয়েছিলেন, পড়েছিলেনও। নীলুকে পিছনে রেখে নিজের বুকে—বলরামের উদ্যত আঘাত নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নীলু পিছন থেকে তাঁকে আঘাত হেনে সরে যেতে

বাধ্য করেছিল। সত্য সত্যই বলরাম নিলুকে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং হৈমবতী মাঝখানে নিলুকে ঢেকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—না—আমাকে খুন কর তুমি তার চেয়ে।

বলরাম ক্ষান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নীলু হয় নি। সে পিছন থেকে হৈমবতীকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল—সরে যাও বলছি। রাক্ষুসী কোথাকার। ডাইনী! এতক্ষণে মায়াকান্না কাঁদতে এসেছ? এবং প্রায়শ্চিত্তের পর সেই দিন রাত্রেই নীলু ঘরের চাল কেটে বের হয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল।

নিরুদ্দেশ হয় নি, মামার বাড়ীতেই সে গিয়েছিল। মামারাই তাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এরপরই সে দিল নিষ্ঠুরতম আঘাত। মামাদের পরিচালনায় নীলুই আদালতের দ্বারস্থ হল। দরখাস্ত করলে—তার বাবা বিমাতার প্রভাবে তার প্রতি স্নেহশূন্য। নিষ্ঠুর অত্যাচার করেন। সুতরাং সে আত্মরক্ষার জন্য মামার কাছে থাকতে চায়। আদালত সেই মর্মে নির্দেশ দিয়ে মাতৃহীন অসহায় বালককে রক্ষা করুন। তার সঙ্গে মামা নীলুর পড়ার খরচ দাবী করে দরখাস্ত করলেন।

বলরাম আদালতে গিয়ে বলে এলেন—ওই ছেলে তাঁর ত্যাজ্য-পুত্র। সুতরাং সে যেখানে খুশী থাকতে পারে। তাকে তিনি কোনদিনই ঘরে নিয়ে যেতে চাইবেন না। এবং ত্যাজ্যপুত্রকে কোন খরচা দিতে বাধ্য নন।

আদালত সে কথা শোনে নি, নীলুর আঠার বছর বয়স পর্যন্ত মাসিক পঁচিশ টাকা খরচা দিতে আদেশ দিয়েছিল। হৈমবতী শয্যা পেতেছিলেন। উঠতে হল স্বামীর অসুখে। বলরাম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। হৈমবতীকে সংসার এবং বিষয়ের ভার নিতে হল।

হৈমবতীর আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। যে হৈমবতী নববধূ রূপে ছিল মধুর ভাণ্ডারের মত সেই হৈমবতী হয়ে উঠল বিষভাণ্ডের মত কটু। যে ছিল আরতির ঘৃত প্রদীপের মত স্নিগ্ধ, সে হল গৃহদাহী বহ্নির মত প্রখর।

বলরাম চাটুজ্জে মারা গেলেন আরও তিন বছর পর। মৃত্যুর পূর্বে উইল করে গেলেন, নীলুকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে হৈমবতীকে করে গেলেন বিষয়ের একচ্ছত্র উত্তরাধিকারিণী। নীলু এই উইল নাকচের জন্য মামলা করলে। উইল জাল। তার সঙ্গে আরও অনেক কথা। কটু কুৎসিত অভিযোগ। হৈমবতী ডেকে পাঠালেন নীলুকে। নীলু লিখে জবাব দিলে না। পত্রবাহককে মুখে বলে পাঠালো—হয় মামলায় জিতে যাব। নয় তো ওই সম্পত্তি যখন নীলেমে বিক্রি হবে তখন নীলেম ডেকে কিনে যাব।

হৈমবতীর চোখের জল মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। অকস্মাৎ শোকের মেঘে বৈশাখের সূর্যের মত যে জীবন-প্রখরতা ঢাকা পড়ছিল মেঘ কেটে সেই সূর্য আত্মপ্রকাশ করল।

তিনি স্বামীর ক্যাম্বিসের ব্যাগে কাপড় গামছা এবং পূজার্চনার জিনিসপত্র পুরে গমস্তাকে সঙ্গে নিয়ে সদরে এসে হাজির হলেন। নীলুর মামার বাড়ীতে নয়, উকীল বাড়ীতে। সেই শুরু। নীলু মামলায় হারল, কিন্তু হৈমবতী আর মামলার তদ্বির ছাড়লেন না। এবং মামলা যেন তাঁর নেশায় দাঁড়াল। দিনান্তে একবার তিনি গ্রাম পরিভ্রমণ করতেন। কার কোথায় নতুন ঘর হচ্ছে, কে কোথায় নতুন জমি কাটাচ্ছে, সেখানে তাঁর সূচ্যগ্র পরিমাণ জমি তারা চাপিয়ে নিচ্ছে কি না দেখে আসতেন। যেখানেই সন্দেহ হ'ত সেখানেই নিজে দাঁড়িয়ে চার হাত লম্বা দাঁড়া দিয়ে জমি মাপ করাতেন। গমস্তা মাপত, তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন ; কখনও নিজেই

এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াটা গমস্তার হাত থেকে টেনে প্রায় কেড়ে নিয়ে বলতেন—দাঁড়া যে লাফিয়ে চলছে গো। দাঁড়া চলবে শুয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করার মত। এমনি ক'রে, এমনি ক'রে। হ্যাঁ। পেট ভরে আছে বুঝি, গুঁড়ি হয়ে দাঁড়াটা মাটিতে শোয়াতে পারছ না।

এই থেকেই তিনি খাণ্ডারণী। এ থেকেই আজকালকার ছেলেরা ঝাঁন্সীর রাণীকে আবিষ্কার করে চীৎকার করে—মেরি ঝাঁন্সী নেহি হুঙ্গি!

এতকাল চীৎকারটাই কানে ঠেকত তাঁর। আজ মানেটা পরিষ্কার হল। তিনি জ্বলে উঠলেন, বললেন, গভরমেণ্টের নামে আমি মামলা করব।

ছেলেগুলোর বাপেদের বাড়ী গিয়ে মুখের উপর বলে এলেন।

আসবার সময় একবার সরকারী কালীতলায় দাঁড়িয়ে চারিদিক চেয়ে দেখলেন। এ সব তাঁর, এ সব তাঁর। কেড়ে নেবে বললেই হল! কেড়ে নিলে তিনি কি করবেন! কি নিয়ে থাকবেন? ঘর থেকে বেরুবেন কি করে? চিরটা কাল নিজের মাটি ছাড়া হাঁটেন নি, পা দেন নি। আজ শেষ বয়সে —। তিনি যথাসর্বস্ব পণ করে মামলা লড়বেন।

*　　　*　　　*

সদর শহরে গিয়ে কিন্তু হৈমবতী দমে গেলেন। উকীল হেসে বললেন, তা কি ক'রে হবে ঠাকরুণ? দেশের দাবী। এ্যাসেম্বলীতে আইন পাশ ক'রে জমিদারী লোপ হচ্ছে। পার্লামেণ্টে আইন করে বাধা বিঘ্ন ঘুচিয়ে দিচ্ছে। এ মামলা ক'রে কি করবেন! বড় বড় রাজা মহারাজা চুপ ক'রে গিয়েছে। আমাদের মহারাজ নিজের বসত বাড়ী বাদে আর সব বাগান বাড়ী গেস্ট হাউস গোশালা আস্তাবল সব বিক্রি করে দিচ্ছেন। বাগান বাড়ীর ওখানে গেলে

দেখতে পাবেন আসবাবপত্র একেবারে স্তূপাকার ক'রে ঢেলে নিলেম ক'রে বিক্রি করে দিচ্ছে। খাস রাজবাড়ীর সামনে দেখতে পাবেন তিরিশ চল্লিশ খানা সে আমলের ঘোড়ার গাড়ী, ব্রুহাম ল্যাণ্ডো ফিটন পড়ে আছে। সব বিক্রি হবে।

অভিভূত হয়ে গেলেন হৈমবতী। অভিভূত ভাবেই প্রশ্ন করলেন —বিক্রি করে দিচ্ছেন ?

—হ্যাঁ।

তিনি সত্য সত্যই দেখতে গেলেন। দেখলেন উকিল এক বিন্দু মিথ্যে বলে নি। ট্রাক গরুর গাড়ী ঠেলা বোঝাই করে রাশি রাশি জিনিস চলেছে। চেয়ার, টেবিল, আয়না, ব্রাকেট, লণ্ঠন, ছবি, আলমারি, বই, মূর্তি, কত বিচিত্র আসবাব যা হৈমবতী চোখেও দেখেন নি।

হৈমবতী নীরব হয়ে গেলেন। এবং বাড়ী ফিরে এসে ঘরের দুয়ার বন্ধ করলেন।

তিনি এখানে থাকবেন কি করে? কোন মুখে বের হবেন পথে? নীলু হাসবে। জমিদারী গেল! লক্ষ্মী-জনার্দনের সেবা কি করে চলবে? ক্ষতিপূরণ? হায় ক্ষতিপূরণ!

না—তিনি এখানে থাকবেন না। লক্ষ্মী-জনার্দনের শিলাকে গলায় বেঁধে তিনি চলে যাবেন—বৃন্দাবন।

হ্যাঁ পথ তিনি পেয়েছেন। এই পথ। যে দিন জমিদারী যাবে, সেই দিনই সকালে তিনি চলে যাবেন।

* * *

১লা বৈশাখ ১৩৬২ সাল।

নীলকান্ত চাটুজ্জে দশটার সময় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আপিসে যাবার জন্ম বের হচ্ছিল। সাইকেল হাতে বাড়ীর ফটকটি বন্ধ করছিল।

শহরের এক প্রান্তে ছোট একতলা একখানা বাড়ী। এখনও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে নি। সামনে বারান্দার ঝিলিমিলি হয় নি, কনক্রীটের ছাদ থেকে শিক বেরিয়ে আছে। অর্ধেক পলেস্তারা হয় নি। আর অনেক কিছু অসম্পূর্ণ। জীবনে বহু উত্থান পতন হয়েছে, অবশ্য উত্থানও বড় নয় পতনও বড় নয়। নীলুর মামাতো ভাইরা অনেক করেছে। যুদ্ধের সময় লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। নীলু পারে নি। নীলুর মেজাজ ভাল নয়। কর্তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে। ঘুষ দিতে গররাজী নয় কিন্তু দেবার প্রস্তাব করতে পারে না। তবু চলে যাচ্ছে। পঞ্চাশের কাছে এসেছে বয়স। চুলগুলি সব পেকে গেছে। মুখে চোখে একটা কঠোর রূঢ়তার ছাপ পড়েছে। বাইসিক্লখানা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পথে নেমেছে, একখানা সাইকেল রিক্সা এসে দাঁড়াল। নামলেন হৈমবতী। নীলু চিনতে পারলো না।—কে? কোথা থেকে আসছেন?

—নীলু? স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে হৈমবতী প্রশ্ন করলেন—এমন বুড়ো হয়ে গিয়েছিস বাবা?

অবাক হয়ে গেল নীলু।—কে? মা? আজ প্রায় তিরিশ বৎসর পর হৈমবতীকে দেখছে নীলু।

—হ্যাঁ। বৃন্দাবন যাব বাবা। জমিদারী তো গেল। তোমাকে ক্ষতিপূরণের টাকার কাগজপত্র সই সাবুদ করে দিয়ে যাই। টাকা নিয়ে আমি কি করব বাবা। তোমার টাকা তুমি নাও।

নির্বাক হয়ে নীলু মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। পঁয়তাল্লিশ বছর আগের একটি ছবি মনে পড়ল। নববধূ হৈমবতীর সেই কোমল লাবণ্য-ঢলঢল মুখের পানে সে তাকিয়ে; মধুর ভাণ্ডারে মধু-মল্লিকার মত অনির্বচনীয় শান্তি খুঁজে পেয়েছিল সে। মুহূর্তে রূঢ় কঠোর মানুষটির যেন কি হয়ে গেল। স্পর্শকাতর সুপরিপক্ক

ফলের মত ও দুটি চোখ যেন ফেটে গেল—গড়িয়ে বেরিয়ে এল জলের দুটি ধারা।

—নীলু।

—মা।

—একবার যে বসতে হবে বাবা!

—কিন্তু বৃন্দাবন কেন যাবে মা?

—না বাবা। আর থাকতে পারব না। কি নিয়ে থাকব।

—কেন জমি জেরাত বাগান পুকুর—

—ও সব তুই নিস।

—ঠাকুর—

নিজের বুকে হাত দিয়ে হৈমবতী হেসে বললেন,—ঠাকুর আমি নিয়ে যাচ্ছি। নিজের যা জুটবে তাই ভোগ দেব। তাই প্রসাদ পাব। আজ তো আর জমিদারীর অহঙ্কার নেই। হাসলেন তিনি!—আবার বললেন—তা নইলে তোর সঙ্গে হয়তো দেখাই হত না রে।

—আমার অনেক অপরাধ মা। কিন্তু সে সব আমি সজ্ঞানে করি নি—মামারা—কথা আর বলতে পারলে না নীলু। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

—কাঁদিস নে বাবা!

—দুঃখ জীবনে অনেক পেলাম মা। কতবার—আবার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। আবার বললে—একবার গ্রামে গিয়েছিলাম। ভাবলাম সন্ধ্যের পর চুপি চুপি গিয়ে ডাকব—মা। কিন্তু দরজার সামনে রাস্তায় দাঁড়ালাম—তোমার রাগের চীৎকার শুনলাম—কতকগুলো ছেলেকে তুমি বকছিলে। সে চীৎকার শুনে আমার

ভয় হল। যদি আমাকে অপমান করে ফিরিয়ে দাও! চুপি চুপি ফিরে পালিয়ে এলাম।

হৈমবতী ওকথার উত্তর দিলেন না। তাঁর চোখ পড়েছিল— নীলকান্তের বাইরের ঘরে দরজাটার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা একখানি কচি মুখের দিকে। বছর চারেকের ছেলের একটি মুখ।

বহু পুরাতন কালের একখানি কচি মুখের ছাপ ওই মুখের মধ্যে।

ওটি? বলতে বলতেই তিনি এগিয়ে গেলেন। এ যে তাঁর ছোট্ট নীলু! সেই নীলু!

৫ই বৈশাখ। কাল বৈশাখীর ঝড় উঠেছিল। খাস খামারের আমতলায় ছেলেদের ছুটাছুটি পড়ে গেছে। আম পড়ছে। ওরা কুড়ুচ্ছে। নীলকান্তের ছেলের ছেলের হাত ধরে ছেলেমানুষের মতই এসে দাঁড়ালেন ঠাকরুণ হৈমবতী।

—কুড়োও বাবা—কুড়োও। ওরে তোরা সব নিস নে। ওকেও দুটো দে। ওরে। ওরে। ছেলেরা থমকে গেল।

হৈমবতী বললেন—আমার ছেলে রে। আমার ছেলে নীলুর ছেলের ছেলে। ওদের নিয়ে আজ ফিরে এলাম যে।

কোন লজ্জা নেই, কোন সঙ্কোচ নেই, কোন দুঃখ নেই। ভাঙার মধ্যে একি নূতন গড়া গড়ে দিলে সে, যে শুধু ভাঙে আর গড়ে, গড়ে আর ভাঙে। আশ্চর্য, আজ তাঁর কাছে পৃথিবী প্রশান্ত প্রসন্ন নবীন। এ যেন নূতন জীবন। না হ'লে কোথায় গেল জীবনের সকল উত্তাপ? এ যেন ব্যাধি মুক্তি। এ যেন জন্মান্তর। নূতন জন্ম। পরিপূর্ণ হ'য়ে গেছে জীবন নীলুর ছেলের ছেলেকে পেয়ে!

ঢেকা

ঠিক সন্ধ্যার সময়, আমাদের দেশের সনাতন গো-যান আশ্রয় করিয়া বাহির হইয়াছিলাম। গন্তব্যস্থান বেশী দূর নয়, ময়ূরাক্ষী নদী পারে ক্রোশ পাঁচেক রাস্তা। স্থানের নাম বেলেড়া, একখানি বৈচিত্র্যহীন ক্ষুদ্র গ্রাম। গো-যানের নিষ্করুণ ধাক্কা এবং চাকার সকরুণ আর্তনাদ ভিন্ন প্রথম রাস্তায় অর্থাৎ ময়ূরাক্ষীর এপারে বিশেষ কিছু ঘটে নাই। ময়ূরাক্ষীর এপারেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ময়ূরাক্ষী পার হইয়া আবার সেই চাকার সকরুণ আর্তনাদ, কিন্তু নিষ্করুণ ধাক্কাটা ক্রমে নিষ্করুণতর হইয়া উঠিল। মনে পড়িল বিজয়চন্দ্রের গান—

'বেহারে বিঘোরে চড়িনু একা।'

মনে মনে গানের দু-একটা শব্দ পাণ্টাইয়া বর্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপাইতে চেষ্টা করিলাম, 'বেহারে'র বদলে 'মাঠানে' চলিতে পারে

কিন্তু 'এক্কা'র পরিবর্তে 'গো-যান' 'গো-গাড়ি' 'গড্ডলিকা' কোনোটাই খাপিল না। হতাশ হইয়া ও চেষ্টা ছাড়িয়া শেষটা ঘুমের চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু 'বিষম-ধাক্কা' আবার গানটা মনে পড়াইয়া দিল। ঘুমও আসে না, গানের নেশাও ভূতের মতো পাইয়া বসিল, —এ তো মহা বিপদে পড়িলাম। করি কি, খুঁজিয়া পাই না। রাস্তার দু-ধারে ভীষণ জঙ্গল একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছিল, গানটা ছাড়িলে যত অনাসৃষ্টি ভাবনা আসিয়া জুটে। বিরক্ত হইয়া ঘড়ি দেখিলাম, ১১॥০ সাড়ে এগারটা বাজে। সর্বনাশ, রাস্তার শেষ নাই নাকি! না, পথ ভুলিলাম? গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম "হ্যাঁ রে রাত যে দুপুর হল, রাস্তা আর কত? রাস্তা ভুল হ'ল নাকি?"

সে উত্তর করিল, "আজ্ঞে বুঝতে লারছি (পারছি) না।"

ব্যাস্ গায়ে কে যেন ঠাণ্ডা জল ছিটাইয়া দিল। আমি কহিলাম—"নেমে দেখ রে বাপু!"

সে কহিল, "আজ্ঞে নেমে আর কি করব? এখানে ত সবই আদাড় (জঙ্গল), কাছে তো গাঁ নাই। কাকে শুধোব?"

হতাশ হইয়া শুইয়া পড়িলাম, তবে একটা সুরাহা হইল, আশঙ্কায় গানের ভূতটা ঘাড় ছাড়িল। গাড়ি চলিয়াছেই, রাস্তার যেন অন্ত নাই। মনে করিলাম একি—শেষ নিরুদ্দেশ যাত্রার অসীমের পথে চলিয়াছি না কি? তা মন্দ নয় যদি সেদিন এমন একটা নিরাপদ যান মেলে তো মন্দ হবে না।

হঠাৎ গাড়োয়ানটা কহিল, "বাবু, আমাদের বা ভুলো লেগেছে গো।"

নিরুদ্দেশ যাত্রায় বিভোর তখন মন, তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো বলিলাম, "লাগুক, তুই ওখানে শুয়ে পড়।"

গাড়োয়ানটার তাহা মনঃপূত হইল না, সে বোধ হয় গো-যানে নিরুদ্দেশ পথে যাইতে রাজী ছিল না। সে নামিয়া অনেক খুঁজিয়া-পাতিয়া শেষে রাস্তা বাহির করিল, এবং দেখা গেল আমরা একটা জঙ্গলে একটা 'তেরাস্তার' মোহনায় ক্রমাগত পাক দিতেছিলাম।

আবার গাড়ি চলিল, গাড়িখানা রাস্তায় পড়িতেই গাড়োয়ানটা নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। তারপর কতক্ষণ বা কত দূর গাড়ি চলিয়াছে জানি না, কারণ রথী সারথী উভয়েই নিদ্রিত ছিলাম, হঠাৎ একটা তীব্র করুণ আর্তনাদে এবং গরু দুইটার ভীত-চকিত উল্লম্ফনে গো-যানের নিষ্করুণতম ধাক্কায় ঘুম ছুটিয়া গেল। গাড়োয়ানটা কাঁদিয়া উঠিল, "বাবু গো ভূত!"

ভূত কি রে বাপু? গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িলাম, আবার সেই তীব্র করুণ আর্তনাদ। মনটা দমিয়া গেল। চারিদিকে চাহিলাম, দেখিলাম, সম্মুখে সারিবদ্ধ আকাশস্পর্শী বৃক্ষরাজী; অদূরে বিশাল, ভগ্ন অট্টালিকা, আর—চারিদিকে আকাশে-বাতাসে যেন একটা গম্ভীর সকরুণ আবছায়া মাখান। জানি না সে আমার মনের ভ্রম, না সত্য! কিন্তু সেদিন তাহা সত্যই অনুভব করিয়াছিলাম, এখনও তাহার অনুভূতি যায় নাই, মানস চক্ষে এখনও তাহা দেখিতেছি, মর্মে এখনও তাই অনুভব করিতেছি।

আবার সেই আর্তনাদ, মনে হইল কে যেন প্রাণের মমতায় প্রাণছাড়া আর্তনাদ করিতেছে। দূরে কে যেন ছুটিয়া পালাইতেছে। প্রাণভয়ে ছুটিয়াছে আর কতকগুলা আততায়ী যেন তাহার অনুসরণ করিতেছে। সত্যই পদশব্দ শুনিয়াছি, শুষ্কপত্র মর্‌মর্ করিয়া উঠিল। হঠাৎ আবার আর্তনাদ আর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা অট্ট চীৎকারে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল আততায়ীর দল যেন পলাতককে ধরিল। তারই এই আর্তনাদ আর আততায়ীর

দলের এই উল্লাস। গাড়োয়ানটা ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল, আমার মাথার ভিতরটাও যেন সব গোলমাল হইয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না শব্দটা কিসের।

সহসা দূরে কে হাঁকিয়া উঠিল—"কে ?"

গাড়োয়ানটা আবার সভয়ে কাঁদিয়া উঠিল, আমিও ভয়ে চমকাইয়া ওই 'কে' শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই ভয়চকিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "কে ?"

সে ব্যক্তি আগাইয়া নিকটে আসিল। সন্ধ্যের কালি পড়িয়া অন্ধকারপ্রায় আলোকটির ক্ষীণ আলোকে দেখিলাম সে মানুষ। প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িতেছিল, আশ্বস্ত হইয়া সে আবার পিঞ্জরে প্রবেশ করিল। তারপর আবার লোকটিকে দেখিয়া বুঝিলাম সে চৌকিদার। সে ব্যক্তিও আমাদের গাড়ি দেখিয়া, আলো দেখিয়া বুঝিল আমরা চোর নহি। বেশভূষা দেখিয়া ভদ্রলোক ঠাওরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কোথা যাবেন ?"

আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় এসেছি বল দেখি বাপু !"

এমন সময় আবার সেই আর্তনাদ আর সেই উদ্দাম অট্ট চীৎকার ! গাড়োয়ানটি আবার ভয় পাইবার কাঁদিবার জো করিতেই চৌকিদার কহিল, "ভয় কি ? ও মউল পাখী ডাকছে, আর শ্যাল (শৃগাল) ডাকছে।"

হবে, তাই হবে, ভয়ে মনে হয়েছিল কত কি। গাড়োয়ানটা ঠাণ্ডা হইতেই আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কোথায় এসেছি বলতে পার ?"

সে কহিল, "আজ্ঞে হুজুর এ ঢেকা !"

ঢেকা, রাজা রামজীবনের ঢেকা। অর্ধ বীরভূম, মুরশিদাবাদ

জুড়িয়া অপ্রতিহত প্রতাপ রাজা রামজীবনের ঢেকা এই ? তবে তো ঐ আর্তনাদ 'মউলে'র নয়, চীৎকার শৃগালের নয়। এ বোধ হয় অতীতের মর্মঘাতী অভিনয়। মনে হইল ওই বুঝি বলি ছিচ্ছেদকারী ছেত্তা প্রাণভয়ে আর্ত্ত চীৎকারে ছুটিয়াছে, আর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়াছে রাজার রক্ত লোলুপ সিপাহীর দল।

চমক ভাঙিয়া গেল, চৌকিদারের প্রশ্নে, "আপনকাদের বাড়ি কোথা ? কোথা যাবেন ?"

হুঁশ হইল, সত্যই তো এই অন্ধকার রাত্রে অতীতের শ্মশানে দাঁড়াইয়া স্বপ্ন দেখার চেয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছান অনেক অধিক প্রয়োজনীয় এবং বাঞ্ছনীয়। যাহা হউক, চৌকিদারের সাহায্যে রাস্তা ধরিয়া প্রায় শেষ রাত্রে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। কিন্তু মন হইতে ঢেকার সোদনের সেই ছবি, সেই স্মৃতি মন হইতে মুছিল না। দিন দুই পরেই সে যেন চুলের মুঠি ধরিয়া আমায় ঢেকার দিকে টানিল। ঢেকায় যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা।

ঢেকার বর্তমান নায়েব শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ ঘোষালের সহিত দেখা করিতেই তিনি সানন্দে আমাকে ঢেকার প্রাচীন কীর্তি সমূহ দেখাইতে অগ্রগামী হইলেন।

প্রথমেই দেখিলাম, ঢেকার বর্তমান জমিদার সোনরুন্দির রাজার ভগ্ন অট্টালিকাটি, ভগ্ন ঠাকুরবাটি, অট্টালিকাটি দ্বিতল, বর্তমানে উপরে উঠিবার সিঁড়ি ভাঙিয়া গিয়াছে, খিলান কতক ফাটিয়াছে কতক ভাঙিয়া গিয়াছে। ঠাকুর দালানটিরও সেই অবস্থা। বর্তমানে কোনো ঠাকুরই এখানে নাই। অবশ্য এ অবস্থায় তাঁহারা পলায়ন করিয়া বুদ্ধিমানের কার্যই করিয়াছেন।

তারপর রাজা রামজীবনের মাটিতে মাটিতে মিশান প্রাসাদ স্তূপ। এখনও প্রাসাদের কিরূপ আকার ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়।

প্রাসাদটির চারিদিকেই তুইটি করিয়া নহবৎখানা শোভিত ফটকগুলির চিহ্ন এখনও সুপরিস্ফুট।

তারপর বরাবর রামসাগর। পথে অনেক জিনিস দেখিবার থাকিল, তাহা ফিরিবার পথে দেখিব স্থির হইল। মাঠের রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া রামসাগরের তীরে উপস্থিত হইলাম। বিশাল দিঘি, এপার-ওপার নজর চলে না। রাজা রামজীবনের নামানুসারে এই দিঘির নাম রামসাগর হইয়াছে। বীরভূমে এত বড় দিঘি আর আছে বলিয়া জানি না। থাকিলেও তুই-একটির বেশী নয়। এই রাম-সাগরের পূর্ব পাহাড়ের উপরের বিশাল মৃত্তিকাস্তূপ দেখিয়া লোকে বলে এইখানে রাজার ঠাকুর বাড়ি ছিল। এই পূর্ব পাহাড়ের সন্নিকটেই গত ১৩৩০ সালে ভীষণ অনাবৃষ্টি হেতু শুকাইয়া গেলে রামসাগরের গর্ভ হইতে একটি 'হাড়কাট' এবং একটি ভগ্ন খাঁড়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভগ্ন খাঁড়াখানির ওজন প্রায় ৭।৮ সের, দৈর্ঘ্য প্রায় তুই হাত। খাঁড়াখানি এখন রাজা রামজীবনের বংশাবলীর হেতিয়াশাখার শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আছে। এই খাঁড়াখানির কথা শুনিয়া মনে হয় এই খানির দ্বারাই রাজার পূজিত দেবীর সমক্ষে পশু হনন করা হইত। বীরভূম বিবরণে লিখিত নওয়া পাড়ার ৺হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাটির কালদণ্ড তরবারিতে নহে।

কারণ প্রবাদ আছে যে, যখন বলি দ্বিচ্ছেদ হয় তখন ছেত্তা প্রাণভয়ে পলাইয়া গিয়া দিঘির ঘাটের পাষাণ সোপানে ঐ খাঁড়ার এক কোপে অর্ধহস্ত পরিমিত গভীর করিয়া প্রোথিত করিয়া দেয়। রাজা রামজীবন এই সংবাদ শুনিয়া ছেত্তাকে মুক্তি দিতে বলেন (তাহার পূর্বে দ্বিচ্ছেদ করার জন্য তাহাকেই দেবী সমক্ষে বলি দিবার আদেশ দিয়াছিলেন) আরও বলেন যে যে ব্যক্তির শক্তিতে এবং

যে অস্ত্রে পাষাণ ভিন্ন হয়, সেই ব্যক্তি ও সেই অস্ত্র কি কখনও একটা ছাগবলি দিতে অক্ষম হয়। এ নিশ্চয় আমার মন্দ ভাগ্যের ফল। সেই বৎসরই নাকি রাজা রামজীবনের মৃত্যু হয়। নওয়াপাড়ার ৺হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাটির খাঁড়াখানি আমি দেখি নাই। বীরভূম বিবরণে—ঐখানির নাম 'কালদণ্ড' উল্লেখ করিয়া যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই—

"নওয়াপাড়ার ৺হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে কালদণ্ড নামে একখানি তরবারি আছে। দৈর্ঘ্য প্রায় তিন হাত এবং প্রস্থ প্রায় দশ অঙ্গুলি। ওজন অন্ততঃ দশ সেরের কম নহে। তরবারির উপরে খোদিত আছে "১০৬৩।১২ জ্যৈষ্ঠ তৈয়ারী উপেন্দ্রচন্দ্র খাঁ।"

এই 'কালদণ্ড' তরবারি রাজা রামজীবন যুদ্ধ কালে ব্যবহার করিতেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় তিনি কিরূপ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। কেহ কেহ এখন বলে—

"হাতীশালায় হাতী কত ঘোড়াশালায় ঘোড়া—
ঢেকার রাজা রামজীবনের তিন পশুরী খাঁড়া"

তিন পশুরী অর্থে পনের সের। তাহা হইতে পারে, প্রায় ৩৫০ শত বৎসর পরেও যে তরবারির ওজন দশ সের তাহা ৩৫০ শত বৎসর পূর্বে নির্মাণকালে ১৫ সের থাকা বিচিত্র নয়।

তারপর রায় ভবানী ও মহেশ দিঘি। এই দুইটি দিঘি সম আকারের ও পাশাপাশি অবস্থিত। আকারে রামসাগর অপেক্ষা অনেক ছোট হইলেও ছোট নহে, এরূপ জলাশয়ও খুব কম দেখা যায়। রায় ভবানী উত্তরে এবং মহেশ দিঘি দক্ষিণে। দুইটিই উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। রামসাগরও তাই। এই দিঘি দুইটির পশ্চিমে আরও দুইটি মধ্য আকারের জলাশয় আছে। ঐ দুইটির উল্লেখ বীরভূম বিবরণে নাই। এই পুষ্করিণী দুইটি সম চতুষ্কোণ ঠিক

পাশাপাশি অবস্থিত। দক্ষিণেরটির নাম 'শিবসাগর'; উত্তরে 'কেশ-কুমারী' তাহার পশ্চিমে রামসাগর।

সন্নিবেশ অনুসারে প্রথমে সর্ব পূর্বে রাজার প্রাসাদ। তাহার পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ঠিক পাশাপাশি রায় ভবানী ও মহেশ-দিঘি, তাহার পশ্চিমে দুইটি সম চতুষ্কোণ দুইটি জলাশয়—শিবসাগর ও কেশকুমারী, তাহার পশ্চিমে মহেশ দিঘি ও রায় ভবানীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ বিশাল রামসাগর।

ঢেকার উত্তর প্রান্তে মাঠের মধ্যে আর একটি দিঘি আছে তাহার নাম চেঁচুড়া দিঘি। বীরভূম বিবরণে ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম দেখিলাম চিরঞ্জীব রায়চৌধুরী।

রাজা রামজীবনের আর এক কীর্তি কলেশনাথের নবরত্নের মন্দির। কলেশ্বর ঢেকার উত্তরে—এক ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরটি এখন ধ্বংসোন্মুখ। নয়টি চূড়ার মধ্যে চারটি ভাঙিয়া গিয়াছে। এই বিরাট মন্দিরের সংস্কারের জন্য বা ভাঙিয়া নূতন মন্দির নির্মাণের জন্য একজন সন্ন্যাসী চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও আমরা দেখিয়া আসিয়াছি।

কলেশনাথের সেবার জন্য রাজা রামজীবন প্রদত্ত দেবোত্তর আজিও বর্তমান। সেই সম্পত্তি হইতেই এখনও সেবা চলিতেছে।

দেবোত্তরের পরিমাণ:

পূজক (নিত্যপূজার জন্য)	৫০ বিঘা
পরিচারক পাণ্ডা	২০০ বিঘা
ঢাকী বাদ্যকর (দুই বেলা ঢাক বাজায়)	১৫ বিঘা
গোয়ালা (দুগ্ধের জন্য)	২৫ বিঘা

পূর্বে গোয়ালা নিত্য ৫ সের দুগ্ধ দিত; কিন্তু বর্তমানে পাঁচপোয়া দেয়।

পুরোহিত (চৈত্র মাসে হোম ও পার্বণ পূজার জন্য) ৪ বিঘা।

অতিথি সেবার জন্য প্রায় ৫৮ বিঘা জমি ছিল। এখন অতিথি সেবাও নাই, জমিও কাহারা ভোগ করে তাহার কোনো নির্ণয়তা নাই।

রাজা রামজীবনের আর এক কীর্তি ছিল ৺তারা মাতার মন্দির। কিন্তু সে মন্দির এখন আর বর্তমান নাই। ৺তারা মাতার বর্তমান মন্দির নির্মাতা ৺জগন্নাথ রায়, রাজা রামজীবনের মন্দির ভাঙিয়া বর্তমান মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।

রাজ রামজীবনের সময় কালদণ্ড অনুযায়ী নির্ণয় করিতে গেলে দাঁড়ায় মুর্শিদকুলি খাঁর পূর্বে সায়েস্তা খাঁর বজ্রশাসন সময়। কিন্তু প্রবাদ শুনা যায় রাজা রামজীবন মুর্শিদকুলি খাঁর সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। তবে হইতে পারে তখনকার দিনে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল। সুতরাং সায়েস্তা খাঁর সময়ের তরুণবীর রামজীবন, সায়েস্তা খাঁর অল্প পরেই মুর্শিদকুলির সহিত বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

রাজা রামজীবনের বংশধরগণ তাঁহার মৃত্যুর পর বীরভূম নবার সেনাপতি আলিনকী কর্তৃক ঢেকা হইতে বিতাড়িত হন।

কুল পঞ্জিকায় রামজীবনের চারি পুত্রের কথা পাওয়া যায়। ভগবতী, রামভদ্র, কেশব ও রামচন্দ্র। রামচন্দ্র কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত 'সত্যনারায়ণ ব্রতকথা' আজিও বীরভূমে প্রচলিত। ঐ ব্রতকথার ভণিতায় পাওয়া যায় :

"রায় মহাশয় সুত, রূপে গুণে অদভুত
কশ্যপ বংশেতে অবস্থান।
যবনে দিলেক তাড়া সেই হইতে ভূমি ছাড়া
নিবসতি ঢেরা মহাস্থান।"

এই ভণিতা হইতে বুঝা যায় রামজীবনের পুত্রগণের সময়ই ঢেকা ধ্বংস হয়। শুনা যায় আলিনকী খাঁ রামজীবনের পুত্র রামচন্দ্রকে পরাজিত করিয়া ঢেকা ধ্বংস করেন। এই ধ্বংস কার্যে রাজা রাম-জীবনের ব্রাহ্মণ কর্মচারীগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'চন্দ্রহাট' নিবাসী ব্রাহ্মণ কর্মচারীগণ এবং মুসলমান সিপাহীগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত বজ্রহাট (বজরহাট) নিবাসী মুসলমান সৈনিকগণ বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতিষ্ঠাতার বিপক্ষে শত্রুগণের সহায়তা করিয়াছিল। এই জন্য এখনও এদেশে প্রবাদ "চন্দ্রহাটের বামুন আর বজর হাটের নেড়ে দিগকে" বিশ্বাস করিতে নাই।

যাহা হউক পরাজিত রায়চৌধুরী বংশ পলায়ন করিয়া তিন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। "এড়োয়ালী, হেতিয়া ও নওয়াপাড়া।" এই তিন স্থানেই রায়চৌধুরী বংশ এখনও বর্তমান।

যাক্ কোথা হইতে কোথা আসিলাম। ঢেকায় 'রামসাগর' হইতে এড়োয়ালী, হেতিয়া, নওয়াপাড়া আওড়াইয়া ফেলিলাম। ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ভূতের ভয়, ইতিহাস তিনে এক খিচুড়ী হইয়া উঠিল যে! যাক্ ভাদ্র মাস, বাদলার সময়, খিচুড়ী চলিতে পারে এই যা ভরসা।

রঙ্গবিচিত্রা

কৌতুকের অভ্যাস আমার জীবনে বলতে গেলে নেই। হয়তো কৌতুক করতেও পারি নে। কথাটার প্রমাণস্বরূপ বলতে পারি— আমার সাহিত্য কীর্তিতে কৌতুক বা হাস্যরসাত্মক রচনার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং এক সময়ে ভাল অভিনয় করতে পারতাম। কিন্তু সিরিও কমিক কি কমিক পার্ট করতে গিয়ে আড়ষ্টতা বোধ করতাম। তা সত্ত্বেও—দু'একটি পার্ট ভাল কি করে করেছিলাম জানি না। নেহাৎ ভাগ্য বা আকস্মিক হয়ে যাওয়া ছাড়া কৈফিয়ৎ খুঁজে পাই নে।

সেই আমার মধ্যে কৌতুক মাথাচাড়া দিয়ে যে কেন উঠেছিল— তা ভেবে পাই নে। অনেকদিন পর গ্রামে গিয়েছিলাম। বন্ধু-বান্ধব এবং আরও দশজন এসেছিলেন দেখতে, দেখা করতে। বেশ জমে উঠেছিল আসর। মন হয়েছিল লঘু—অনেকটা যেন চাপল্য

পেয়ে বসেছিল আপনা আপনি। এরই মধ্যে শূলপানি চাটুজ্জে—তাঁর হাঁকডাক করা গলায়—হাঁক দিয়ে বাড়ী ঢুকলেন, বাবাজী এসেছ শুনলাম।—কই দেখি! আরে বাপরে বাপরে! ইত্যাদি। শূলপানি সম্পর্কে কাকা। সরল মানুষ—গাঁজা খান—যত ক্রোধী তত সাহসী। এক সময় বাঘ মেরেছেন একটা। সে-সময় তাঁর দুর্ধর্ষপনায় গ্রাম বলতে গেলে সন্ত্রস্ত থাকত। এখন একেবারে অন্য মানুষ। করুণ বিষণ্ণ শান্ত। এটা হয়েছে স্ত্রী বিয়োগ হয়ে। ৪৫ বছরে স্ত্রী বিয়োগের পর থেকে ক্রমশঃ লোকটা কেমন হয়ে গেছে। আমি আহ্বান করে—সমাদর করেই বসালাম। তিনি আমার গুণপনার কথা বলতে শুরু করলেন। বন্ধু ছকু মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে—এর মধ্যে আর দেখা হয়েছে নাকি? তার মুখের দিকে তাকালেন শূলীকাকা। ছানির চশমা পরা চোখ তুলে। ছকু বললে—খুড়ীমা! কাকা দীপ্ত হয়ে বসে বললেন—রোজ। নিত্য। বুঝেছ—ঠিক ভোর বেলা।

ছকু বললে—ভোর বেলার স্বপ্নও তো মিথ্যে হয় না।

শূলীকাকা বললেন—মিথ্যে কে বলে? আমার সম্পত্তি বাজী! হাঁ। মিথ্যে হলে আমার সম্পত্তি তাকে লিখে দিয়ে যাব।

শূলপানি কাকার জমিজোত আছে ভালই। সন্তান নেই সন্ততি নেই—এক গাঁজা ছাড়া অপব্যয় নেই। সুতরাং সম্পত্তি অটুট আছে। তা ছাড়া লোকটিও হিসেবী।

ছকু বললে—তা হলে আসছেন কই তিনি? ষোল বছর পার হয়ে গেল!

—আসবে। আসবে। নিশ্চয়ই আসবে হে বাপু!

তারপর তাঁরই কথা বলতে লাগলেন তিনি। অর্থাৎ বিগত স্ত্রীর কথা। তিনি মরবার সময় বলেছিলেন—"তুমি যেন বিয়ে করে বসো

না। আমি ফিরে আসব।"বলেছিলেন না বলেছিলেন, শূলপানি জানেন —তবে তিনি এই কথা বলে আসছেন—স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে। তখন তার বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ। কালের দিক থেকে সেটা ১৯৩৫ হবে, তখনও মেয়ের বিয়ে একটা প্রচণ্ড সমস্যা। এবং মেয়েরা তখন খুব কমই চাকরী-বাকরী করে। ৪২ সালও আসে নি—যখন নাকি —যুদ্ধ প্রথম মেয়েদের টেনে কাজে বের করেছিল। সুতরাং স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিঃসন্তান ৪৫ বছরের সম্পত্তিবান—শূলপানির বিয়ের সম্বন্ধ অনেক এসেছিল। দেশে তখন এখনকার মত ২৫।৩০।৪০ বছরের কুমারী মেয়ে না থাকলেও বিয়ের সমস্যায় ১৬।১৭ বছরের মেয়ের অভাব ছিল না। কিন্তু শূলপানি ধরে ছিলেন—উঁহু। সে আসবে। ১৪।১৫।১৬ বছরের হয়ে। তাঁর বয়স যে ষাট পার হয়ে যাবে সে কথাট। ভাবেন নি। এবং এখনও ভাবেন না। চুল সাদা হয়েছে। মুখে রেখা পড়েছে। চোখে ছানি কাটিয়ে চশমা নিতে হয়েছে—কুঁজোও হয়েছেন—তবু ভাবেন—সে আসবে। এবং হয়তো বা আজই আসছে—এই ধরেই বসে আছেন। বলতে গেলে পথ চেয়েই আছেন।

আজও এরপর থেকে সেই কথাই শুধু বলে গেলেন। সকলেই মুখ টিপে হাসছে—কৌতুকবোধ করছে—এ সত্য তিনি দেখেও দেখেন না—বুঝেও বোঝেন না। তিনি উঠে গেলে—আমার কৌতুকবোধ জেগে উঠল—মনে পড়ল 'প্রফুল্ল' নাটকে—বিয়ে পাগলা বুড়োর কথা—যার সঙ্গে পাড়ার ছেলেরা কৌতুক করে যাত্রাদলের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। বললাম ছকুকে—দাও না একটা লাগিয়ে—হোক না মজা।

*   *   *

অবশ্য তা করি নি। তবে যে কদিন থাকলাম—কৌতুক বশেই

—শূলপানি কাকার বিশ্বাসটাকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে দিলাম। জন্মান্তর স্মৃতি নিয়ে যারা জন্মায় তাদের গল্প বললাম। কিছু পড়া গল্প কিছু বানানো গল্প।—শূলপানি কাকা আরও ক্ষেপে উঠলেন। সে আসবে! সে আসবে! সে আসবে!

মাস কয়েক পর হঠাৎ ছকুর চিঠি পেলাম।—"শূলপানি কাকার সে আসিয়াছে।" ছকু লিখেছে—হঠাৎ এক নবদ্বীপ অঞ্চলের ভদ্রলোক এসে তাঁকে বলেছেন—তাঁর কন্যা বলে—শূলপানি চট্টোপাধ্যায়ই তার পূর্ব জন্মের স্বামী। তিনি তাঁর কন্যার বাঞ্ছিত মতেই এখানে এসেছেন। শূলপানি কাকা নাচছেন এবং দু হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করে বলছেন—আচ্ছা লোক। সাচ্চা আদমী। তা নইলে বড় হবে কেন? শূলপানির উত্তরাধিকারীরা তাঁকে অনেক বোঝাচ্ছে, অনেক স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়ে বলাচ্ছেন—কিন্তু শূলপানি বলেছেন—আমি না হয় মুর্খ হতে পারি—ও তো নয়। সে বলেছে!

শূলপানি কাকাকে আমি একখানা পত্র লিখেছিলাম নিবৃত্ত হতে। কিন্তু তিনি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন—এ ওরা অর্থাৎ উত্তরাধিকারীরা ধরে পেড়ে লিখিয়েছে। মানি না চিঠি।—এবং বিবাহও তিনি করেছিলেন—আড়ম্বরের সঙ্গে। কিন্তু মাস ছয়েক না-যেতেই মারা গেলেন।

তার কিছুদিন পর গ্রামে গেলাম। একদিন পরই নরুণ পেড়ে কাপড় পরা মাথায় অল্প ঘোমটা দিয়ে একটি যুবতী মেয়ে এসে দাঁড়াল। কালো রঙ—রূপ যাকে বলে—তার এক বিন্দুও নেই। বছর পঁচিশেক বয়স। ছকু বললে—শূলপানি কাকার স্ত্রী।

চমকে উঠলাম।

মেয়েটি বললে—বাবা তিনি বলে গেছেন বিপদে পড়লে আপনার কাছে আসতে।—আমি বিপদে পড়েছি। একটু সাহায্য করুন! আমার বাপ বলতে গেলে জোচ্চোর।

মেয়েটির বাপ—শূলপানির বিবরণ কেমন করে শুনে মেয়েকে বাধ্য করেছিল বলতে—যে সেই তার পূর্ব জন্মের স্ত্রী। এবং বিবাহ দিয়ে—এই বাড়ীতেই তারা সপরিবারে বাস করছে। আজ সে বিধবা—আজ সম্পত্তি তাদের নামে করে নিতে চায়। মেয়েটি কিন্তু তা চায় না। সে স্বামীর নামেই কিছু করে যেতে চায়।

তাই সে এসেছে আমার কাছে।

কি করলাম—সে পরের কথা। কিন্তু যা করেছি তার জন্য বেদনার আর অন্ত রইল না। কৌতুক করতে গিয়ে এ কি করেছি আমি?

গান

(আমি) ভালবেসে এই বুঝেছি
সুখের লাগি সার সে চোখের জলে রে
তুমি হাস আমি কাঁদি
বাঁশি বাজুক কদমতলে রে।
আমি নিব সব কলঙ্ক
তুমি হবে আমার রাজা
হার মানিব তুলিয়ে দিয়ে
জয়ের মালা তোমার গলে রে।
আমার ভালোবাসার ধনে
হবে তোমার চরণ পূজা
তোমার চোখের আগুন যেন
বুকে আমার পিদিম জ্বালে রে।

২

আমার মনের অঙের (রং-এর) ছটা
তোমায় ছিটে দিলে না—
পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হে—
সে জল পাতা নিলে না—
টলোমলো—টলোমলো—হায়
বঁধু হে প'ড়ে তেল—
চোখের জলের মুক্তো ছটা
মাটির বুকে ঝলে না।

৩

আমার বিয়ে যেমন-তেমন দাদার বিয়ের রায়বিশে

আয় ঢকাঢক মদ খেসে

দাদার চোখে অঙের নেশা

(তোরা) নেশার রঙে চোখ রাঙাসে—

পরব পায় (পর) চুটকী ঘুঙুর

ঝুমাঝুম বাজবে কিসে ?

নাকে দিব নথের কাঁদি

বউয়ের ভাই তু দাম দিসে !

আর ঢকাঢক মদ খেসে

মদ খেসে লো মদ খেসে

যাক না মাথার সীন (ঘোমটা) খুলে—

গায়ের আঁচল বা খসে

লে হেসে লো লে হেসে

সে হেসে আজ যত পারিস

কাল তাড়াবে বউ এসে

মরণ! বউয়ের ভাইয়ের করণ দেখ

পরাণ বুঝি যায় কেশে

দাঁড়ায় আমার গা ঘেঁষে।

৪

মধুর মধুর বংশী বাজে

কোথা কোন কদমতলীতে

আমি পথের মাঝে পথ হারালাম

ব্রজে চলিতে

পোড়া মন ভুল করিলি

চোখ তুলিলি পথের ধুলা থেকে

রাই যে আমার রাঙা পায়ের

ছাঁপ গিয়েছে এঁকে

ঢুকলি ছেড়ে পথের ধুলো

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ গলিতে ॥

অনেক আলোর ঘটায় অনেক

ছটা ঝলোমলো

আমার হাতের মাটির পিদীম

লাজে নিভাইলো

এখন যে হায় গভীর আঁধার

কোন পথে ঘাট বলো ললিতে ॥

মধুর মধুর············

৫

চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে বলে
কে দেখে না চাঁদ।
সে চোখ আমার যাক না কেন
ঘুচিয়ে দিয়ে মনের সাধ।
ও গো চাঁদ, তোমার লাগি
না হয় আমি হব বৈরাগী
পথ চলিব রাত্রি জাগি—
সাধবে না কেউ আর তো।
চাঁদ তুমি আকাশে থাক
আমি তোমায় দেখব খালি।
ছুঁতে তোমায় চাই না কো হে চাঁদ,
সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।
তাই চলেছি দেশান্তরে
আঁধার দেশে ফিরব ঘুরে
ষোলকলায় তুমি বাড়
জ্যোৎস্নাধারা ঢালো খালি
আমি তোমায় দেখব খালি।

৬

ও হায় চোখে ছটা লাগিল

তোমার আয়না বসা চুড়িতে

হাজার বাতি জ্বলিল

আমার আঁধার পুরীতে

(তোমার আয়না বসা চুড়িতে)।

মরি-মরি বলি-হারি

চোখে যে আর সইতে নারি

ঝিকি মিকি ঝিলিক নাচে

হাতের ঘুরি ফিরিতে

আমার প্রাণের ব্যায়লা বাজে

তোমার চুড়ির ছবিতে

(তোমার আয়না বসা চুড়িতে)।

ও হায় হায় আমি যদি হতেম চুড়ি

কাঞ্চন নয় কাঁচ বেলোয়ারী

থাকতেম ঐ হাতটি ঘেরি

জেবন সফল করিতে

হায় হায় থাকত না খেদ মরিতে

(তোমার আয়না বসা চুড়িতে .)

৭

আহা, লাল পাগুরী বেঁধে মাথে

রাজা হলে মথুরাতে

বাঁশি ছেড়ে দণ্ডহাতে বঁধু হলে দণ্ডদাতা

কলঙ্কিনী রাধার দণ্ড না দিলে মান থাকে কোথা ?

এখন আমি নালিশ করি

মাখন চুরি বসন চুরি

শেষে মন অপহরি ফেরারী চোর গেল কোথা ?

বেঁধে এনে বিচার কর শুনব নাকো ছুতোনাতা।

বঁধু তুমি রাজা হয়ে কেন হলে হায় বিধাতা।

৮

আমার মনের মানুষ গো

তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর।

ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা—

আমায় হোথা টানে নিরন্তর

সে ছটাতে ঘর জ্বলিল

পথ করিলাম সার

চার কোণে চার বৃন্দাবনে

বংশী বাজে কার

মন ভুলিল, পথ হারালাম ছটার সুরে গো

সুখের একি আকুল আতান্তর !

৯

তোমার শেষ বিচারের আশায়—
বসে আছি। তোমার রাজকাছাড়ীর দেউড়ীতে হে—
বসে আছি।
চোখের জলই পাওনা কি হায় শুধু
এই জীবনের বিকিকিনির পেশায়।
কি যে আমার পাওনা দেনা—
তুমি ছাড়া কেউ জানে না—
অপর জনে—তা মানে না—ডিক্রি নিয়ে শাসায়।
খেয়া ঘাটের পারে পারে
মাশুল দিয়ে বারে বারে
শেষ খেয়ার ধারে এবার এলেম দেউলে দশায়
পাওনা যদি না থাকে তো বল অকূলে কূল ভাসাই
অথৈ পাথার সর্ব নাশায়।

১০

ওরে আমার ভাই রে
বলি তোর—আমার তরে ভাবনা কেনে হায় রে।
অন্ধকারেই পরাণপাখি সেই হ্যাশেতে যায় রে।
লম্ফ পিদীম চন্দ সূর্য—তাই রে নাই রে নাই রে।
না থাক:
আছে একজনা ভাই—
এগিয়ে এসে হাতটি বাড়ায়
দুই চোখে তার দুইটি পিদীম
হায় সেকি রোশনাই রে!
সেই জনা মোর মনের মানুষ
এই খানে খোঁজ পাইরে।

কবি তারাশঙ্কর ॥ জগদীশ ভট্টাচার্য

১

বাংলার কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সার্থকতম উত্তরসূরি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁকেই প্রথম সম্পূর্ণ-মানুষের শিল্পী বলা যেতে পারে। একজন বিদেশী সমালোচক বলেছেন, উপন্যাস শুধু গল্পের সন্দর্ভমাত্রই নয়, তা মানব-জীবনের সন্দর্ভ ; উপন্যাসই প্রথম শিল্প যা সম্পূর্ণ-মানুষকে গ্রহণ ক'রে তাকে রূপায়িত করার জন্য প্রয়াসী। "The novel is not merely fictional prose, it is the prose of man's life, the first art to attempt to take the whole man and give him expression." [The novel and the People— Ralph Fox]। প্রাক্‌তারাশঙ্কর বাংলা কথাসাহিত্য ছিল মূলত হৃদয়াবেগের গন্ধ শিল্প। তারাশঙ্করের উপন্যাসেই প্রথম রূপ পেল সমগ্র-মানুষ। শুধু শিশ্নোদরপরায়ণ জৈবিক মানুষ নয় ; অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে যে মানুষ সম্পূর্ণ, সেই একাধারে জৈবিক ও আত্মিক মানুষের কথাই হল উপন্যাসের উপজীব্য।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের আরেকটি উল্লেখ্য কীর্তি হল : তিনিই প্রথম একটি বিশাল জনপদকে উপন্যাসের নায়কপদে স্থাপিত করলেন। মানুষ মহাকালের সন্তান। সেই মহাকালের যে-রূপ

একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীর সুখদুঃখের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তাকেই তারাশঙ্কর ভাষা দিয়েছেন তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে। যে-গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থায় ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ভারতের আপামর সর্বসাধারণ এক অদৃশ্য রাখীবন্ধনে বাঁধা রয়েছে সেই সমাজব্যবস্থার মর্মমূলে প্রবেশ করে তিনি প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ বাস্তবতার মধ্যে ভারত-জীবনকে আবিষ্কার করেছেন। আধুনিক নগরকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে আমরা অবহেলিত পল্লীমানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম, তাই একালের সাহিত্য একান্তভাবেই নাগরিক মানসের সৃষ্টি। তারাশঙ্করই প্রথম কথাশিল্পী যিনি কৃষাণের জীবনের শরিক হয়ে, কর্মে ও কথায় তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা অর্জন করে, বাংলা সাহিত্যকে অবজ্ঞাত পল্লীর অনভিজ্ঞাত মানবসমাজে ছড়িয়ে দিলেন। তাঁর 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' ও 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'তে সমাজের অন্তেবাসী ব্রাত্য ও গোত্রহীন মানুষের দল সরস্বতীর আঙিনায় প্রবেশাধিকার পেল। বিপুলায়তন জনপদের লক্ষমানুষের কলধ্বনি শোনা গেল সাহিত্যে। তাঁর হাতে আমাদের মঞ্জুভাষী কথাশিল্প হয়ে উঠল সার্বভৌম জীবনশিল্প।

এই জীবনশিল্পী তারাশঙ্কর একালের একজন মহৎ শিল্পী। আর, কে না জানে, মহৎ শিল্পীর সিদ্ধি শুধু সুন্দর শিল্পরচনাতেই নয়, মহৎ শিল্পী স্বভাবধর্মে কবি। তাঁর সর্বোপরি-দৃষ্টিতে জীবনের অপরিজ্ঞাত রহস্য নবনব রূপে উন্মেষিত হয়। অশিববিনাশী প্রেরণায় তিনি সহৃদয়চিত্তকে উজ্জীবিত করেন। চেতনাকে তিনি সম্প্রসারিত করেন গভীরতর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে। এই অর্থে মহৎ শিল্পী মাত্রেই যথার্থ কবি। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরচরিতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার

দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।" বক্তব্যটি আরো সুন্দর ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে পাশ্চাত্য দার্শনিক হোয়াইটহেডের উক্তিতে। সমারসেট মম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশখানি উপন্যাসের আলোচনার উপসংহারে মহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে হোয়াইটহেডের উক্তিটি উদ্ধার করেছেন। হোয়াইটহেড বলেছেন, "Great art is more than transient refreshment. It is something which adds to the soul's self-attainment. It justifies itself both by its immediate enjoyment, and also by its discipline of the inmost being. Its discipline is not distinct from enjoyment, but by reason of it. It transforms the soul into the permanent realization of values extending beyond its former self." আমরা একেই বলেছি চেতনার সম্প্রসারণ, জীবনের নবমূল্যায়ন। এই ফলশ্রুতিতেই তারাশঙ্করের সাহিত্য মহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত, এই অর্থেই তারাশঙ্কর কবি।

২

রবীন্দ্রনাথ কবিমানসের যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন সেগুলি হল বিস্ময়, প্রেম ও কল্পনা। আমাদের দেশের প্রাচীন অলংকারিকেরা বিস্ময়কে ন-টি স্থায়িভাবের মধ্যে গণ্য করেছেন। অদ্ভুত রসের স্থায়িভাব বিস্ময়। আমরা তাকে বলতে পারি চিত্তবিস্ফার। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্যদর্পণে বলেছেন :

বিবিধেষু পদার্থেষু লোকসীমাতিবর্তিষু।
বিস্ফারশ্চেতসো যস্তু স বিস্ময় উদাহৃতঃ ॥

এই সংজ্ঞার লোকসীমাতিবর্তিতার অর্থ, আধুনিক ভাষায় বলা যেতে

পারে, আশ্চর্যবত্তা, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় strangeness। প্রতিদিনের অতিপরিচিত তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর মধ্যেও আশ্চর্যবত্তা যে দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই কবিদৃষ্টি। শুধু তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুই নয়, জীবনের গভীরতম সত্যোপলব্ধির মধ্যেও আছে এই বিস্ময়বোধ। মৃত্যুই মর্ত্যলোকে মানুষের অনিবার্য নিয়তি। এ কথা জেনেও মানুষের জিজীবিষার অন্ত নেই। এই মানবসত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মহাকবি বেদব্যাস বলছেন, 'কিমাশ্চর্যমতঃপরম্?' এখানে মহত্তম বিষাদ-চেতনাতেও বিস্ময়বোধই ক্রিয়াশীল রয়েছে।

কবিমানসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রেমের মুখ্যগুণ হল অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দরকে, সামান্যের মধ্যেও অসামান্যকে দেখা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' কবিতাটি মনে পড়ছে। কবি বলছেন:

আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়,
আনন্দ আছে নিখিলে।
মিথ্যায় ঘেরে, ছোটকণাটিরে
তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।
জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার-মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চির-গৌরব—
এ-কথা না যদি শিখিলে,
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে।

যে দৃষ্টিতে জগতের ধুলায় ধুলায়, অণু রেণুর মধ্যেও একটি 'চির-গৌরব' উদ্ভাসিত হয় সেই দৃষ্টিই প্রেমদৃষ্টি।

কবিমানসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল কল্পনা। রবীন্দ্রনাথ কবি-কল্পনাকে বলেছেন, 'অপরকে আপন করার, অপরের মধ্যে প্রবেশ

করার শক্তি। তিনি বলেছেন, "যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে-শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি, এই কল্পনাশক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ করে তোলে, যা-কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়।" [সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের পথে]

কবিমানসের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য—বিস্ময়, প্রেম ও কল্পনা—একত্রজড়িত। তবু তাদের পৃথক পৃথক ভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। তারাশঙ্করের কবিমানসে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য কিভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে তার ইঙ্গিত দেবার জন্য নিম্নে তিনটি দৃষ্টান্ত উদাহৃত হল।

তারাশঙ্করের একটি অসাধারণ গল্প 'ডাইনি'। এই গল্পের পটভূমি জলহীন ছায়াশূন্য দিগন্তবিস্তৃত ছাতিফাটার মাঠ। গ্রীষ্মকালে শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্যনির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। এই ছাতিফাটার মাঠেরই একপ্রান্তে এক নির্জন আমবাগানে ডাইনির বাস। তার নাম স্বর্ণ ডাইনি। যখন বয়স বছর বারো তখন একদিন বামুন পাড়ার হারু চৌধুরি তাকে প্রথম সচেতন করে দিয়েছিল যে, সে ডাইনি, তার নজরে এক ব্রাহ্মণসন্তান পেটের ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছে। সেই থেকে কত অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে সে মানুষ নয়, মানুষের দেহরসলোলুপা রাক্ষসী। বারবার অনেকের মুখে শুনে শুনে তার নিজেরও কেমন এক বিশ্বাস হয়েছে যে তার নরুণ-দিয়ে-চেরা ছুরির মতো চোখে, বেড়ালীর মত দৃষ্টিতে যাকে তার ভালো লাগে তার আর রক্ষা থাকে না। তার স্বামীকেও একদিন সে শোষণ করে মেরে ফেলেছিল। মায়ের কোলে কচি শিশু, স্বাস্থ্যবতী যুবতী-মায়ের হয়ত প্রথম সন্তান, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ

—কচি লাউডগার মতো নরম সরস। ডাইনির দৃষ্টিপথে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলে যায়, নরম গরম লালায় মুখটা ভরে ওঠে। যেন শিশুর দেহের সমস্ত রস নিঙড়ে নিঙড়ে পান করছে সে। মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তার রসাস্বাদ। সুতরাং শুধু জনপদের সবারই নয়, হতভাগিনীর নিজেরও বিশ্বাস যে সে ডাইনি। কতবার সে দেবতার কাছে কাতর হয়ে মানত করেছে, 'মা, আমাকে ডাইনি থেকে মানুষ করে দাও। আমি তোমাকে বুক চিরে রক্ত দেব।' মা মুখ তুলে চান নি। চল্লিশ বৎসর এই অভিশপ্ত জীবন যাপনের পর একদিন ঘটনাচক্রে রটে গেল যে সর্বনাশী ডাইনি বাউরীদের একটা ছেলেকে বাণ মেরে মেরে ফেলেছে। এই দুঃসংবাদ রটনার পর তার আর রক্ষা নেই। সুতরাং তাকে উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে। ছাতিফাটার মাঠ আগুনে পুড়ছে নিস্পন্দ শবের মতো। একটা অস্বাভাবিক গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। উপায়ান্তর না দেখে বৃদ্ধা ডাইনি নেমে পড়ল সেই ভয়ংকর মাঠের বুকে। দুর্দান্ত ঘুর্ণিঝড় এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল তাকে। গল্পের উপসংহারে তারাশঙ্কর লিখছেন :

'পরদিন সকালে ছাতিফাটার মাঠের প্রান্তে সেই বহুকালের কণ্টকাকীর্ণ খৈরীগুল্মের একটা ভাঙা ডালের সুচালো ডগার দিকে তাকাইয়া লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না; শাখাটার তীক্ষ্ণাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী।...

'অতীত কালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতিফাটার মাঠ আজ আরো ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকের দিক্‌চক্ররেখার চিহ্ন নাই; মাটি হইতে আকাশ পর্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসর শূন্যলোকে কালো কতকগুলি সঞ্চরমান বিন্দু ক্রমশ আকারে বড় হইয়া নামিয়া আসিতেছে।

'নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল।'

এই গল্পে ওই হতভাগিনী উনমানবীর প্রতি তারাশঙ্করের করুণা ও সমবেদনা ফল্গুধারায় বহমান। মানুষের জীবনের এই আশ্চর্য পরিণাম তাঁর কবিমানসকে বিস্ময়ে আপ্লুত করেছে। তাই গল্পের পরিণতি বীভৎসে নয়, অদ্ভুতরসেই সমুত্তীর্ণ হয়েছে।

৩

তারাশঙ্করের আরেকটি গল্প 'তমসা'। এই গল্পের নায়ক অন্ধ ভিখিরীছেলে পঙ্ক্ষী। 'কুৎসিত চেহারা, চোখ দুটো সাদা, সামনের মাড়িটা অসম্ভব রকমের উঁচু, চারটে দাঁত বেরিয়ে আছে, হাত-পাগুলো অপুষ্ট অশক্ত।' সব কিছু মিলিয়ে বীভৎসতার প্রতিমূর্তি যেন। কিন্তু এই বীভৎস মানবকটির অন্তরে যে পরম তৃষা রয়েছে তাই তাকে করেছে সুন্দর, করেছে চক্ষুষ্মান। অন্ধ পঙ্ক্ষী গান গায় 'চোখে ছটা লাগিল, তোমার আয়না-বসা চুড়িতে।' অন্ধের পৃথিবী শব্দ আর স্পর্শময়। সুরের মাধ্যমেই সে ধরতে চায় প্রাণকে, স্পর্শের মধ্যেই পেতে চায় সুন্দরকে। এই শব্দ ও স্পর্শময় জগতের মধ্যেই পঙ্ক্ষীর জীবনে এল খেমটা-নাচের দলের এক তরুণী নাচনেওয়ালী। তারও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার মধ্যে তার অজ্ঞাতসারেই লালিত হচ্ছে সুন্দরের সাধনা। তাই তারও কণ্ঠে গান, 'কালা, তোর তরে কদম-তলায় বসে থাকি।' যে-তৃষা পঙ্ক্ষীর অন্ধ চোখে রূপের ছটা লাগিয়ে দেয়, সেই তৃষাই স্বৈরিণী তরুণীর প্রাণে প্রেমিকের প্রতীক্ষা রচনা করে।

ব্রাঞ্চ-লাইনের ছোট্ট একটি স্টেশনে একদিন ঘটনাচক্রে উভয়ের দেখা। তরুণীটির কণ্ঠে রয়েছে আশ্চর্য গান। পঙ্ক্ষীর লোভ হল তার গান শোনার। অন্ধ ভিখিরী-বালকের প্রতি করুণা হল

তরুণীটির। সে গাইল 'কালা তোর তরে কদমতলায় বসে থাকি।' তারপর, তারাশঙ্কর লিখছেন,—

"পঙ্কীর সর্বাঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। মস্তিষ্কের মধ্যে শিরায় উপশিরায় ওই গানের ধ্বনি-ঝংকার বীণার বহুতন্ত্রী ঝংকারের মত ধ্বনি তুলে সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তার।

গান শেষ হয়ে গেল। অন্ধকে গান শুনিয়ে মেয়েটির ভারি তৃপ্তি হল। ঈষৎ হেসে সে প্রশ্ন করলে, 'কেমন? ভাল লাগল?

'আজ্ঞে।'—চকিত হয়ে উঠল পঙ্কী। তার অসাড় নিস্পন্দ শরীরে মুহূর্তে চেতনার প্রবাহ বয়ে গেল।

'ভাল লাগল?'

পঙ্কী বললে, 'জেবন ধন্য হল আমার ঠাকরুন।'

* * * *

পঙ্কী বললে, 'একটি পেনাম করব আপনাকে?'

'প্রণাম? কেন?'

'ভারি সাধ হচ্ছে।'.

লোভ হল মেয়েটির। মুগ্ধ দৃষ্টি, অজস্র প্রশংসা, প্রেম-গুঞ্জন—অনেক পেয়েছে সে এবং পায়। কিন্তু প্রণাম? মনে পড়ল না তার। নিজেদের সমাজের ছোটরা অবশ্য প্রণাম করে। কিন্তু এ প্রণামের দাম অনেক বেশি বলে মনে হল তার। সে প্রতিবাদ করলে না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

পঙ্কী হাত বুলালে তার পায়ের উপর, তারপর মেয়েটির দুখানি পায়ের উপর নিজের মুখখানি রাখলে।

মেয়েটির ভারি ভাল লাগল।

মেয়েটি পায়ে উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলে, পঙ্কীর বিস্তৃত চোখ

থেকে জল ঝরে তার পায়ে লাগছে। তবু সে পা সরিয়ে নিলে না।
* * * [অনেকক্ষণ পরে মেয়েটি বললে] 'ওঠ। ওঠ।'

এবার পঙ্ক্ষী উঠল। তার দিকে চেয়ে [খেমটার দলের] কালো মেয়েটি এবং হারমোনিয়াম-বাজিয়ে এক সঙ্গে হেসে উঠল। পঙ্ক্ষীর চোখের জলে ভিজে মেয়েটির পায়ের আলতা অন্ধের মুখময় লেগেছে—গালে নাকে কপালে ঠোঁটে—মুখময় লাল রঙ।

মেয়েটি বললে, 'মুখটা মোছ। গোটা মুখে তোমার লাল রঙ লেগেছে।'

'লাল রঙ?'

'হ্যাঁ আলতা লেগেছে।'

'আলতা?'

'হ্যাঁ, ঠোঁটে মুখে গালে নাকে। মুছে ফেল।'

'থাকুক আজ্ঞে।'

* * *

[খেমটার দলের মেয়েরা স্টেশনের কাছে পুকুরের জলে নাইতে গেল। অন্ধ পঙ্ক্ষীই তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।]

...ঘাটের ধারে বসেছিল সে, মেয়েটি ঠাণ্ডা জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে তার কথা শুনছিল। পঙ্ক্ষী বললে, 'আমার দিদি আছে। দিদি আমাকে ভালবাসত, কোলে নিত। তা, এই আপনকার মতন বয়েস তার।'

'আমার মত?'—ঈষৎ হেসে মেয়েটি বললে, 'আমার বয়েস কি করে বুঝলে তুমি?'

সলজ্জ হাসি হেসে মাথা চুলকে পঙ্ক্ষী বললে, 'তা, আপুনি আমার চেয়ে এই খানিক বড় হবেন। তার বেশি নন।' একটু চুপ করে থেকে বললে, 'গলার রজ্ শুনে বুঝতে পারি কিনা খানিক আধেক।

আপনার গলা এখনও বাঁশীর মত। খাদ মেশে নাই। তা-ছাড়া—'

পঙ্কী থেমে গেল। সে বলতে পারলে না কথাটা। পায়ের উপর মুখ রেখেছিল সে, কোমল মসৃণ স্পর্শ এখনও সে যেন অনুভব করছে।"

এই শ্রেণীর গল্পে তারাশঙ্করের কবিকল্পনাই মুখ্যভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। ওই অন্ধ ভিখিরী-গায়কটির সঙ্গে একাত্ম হয়েই কথাশিল্পী তার অন্তরের পরম তৃষাকে ভাষা দিয়েছেন।

৪

তারাশঙ্করের কবিমানসে 'প্রেমে'র স্বরূপ নির্ণয়ে আমরা তাঁর একখানি উপন্যাসের সাহায্য গ্রহণ করব। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পাষাণপুরী।' পাষাণপুরীর নায়ক ফাঁসির আসামী কালী কামার। আদিম প্রবৃত্তি যাদের মধ্যে বল্গাহীন উদ্দামতায় অসংযত এমন বহু দুর্দান্ত দুর্বৃত্ত চরিত্র তারাশঙ্কর সৃষ্টি করেছেন। তাদেরই আদি-সৃষ্টি কালী কামার।

বাগ্‌দীর মেয়ে বাসিনীকে ভালবাসত কালী কামার। বাসিনীর প্রতি প্রলুব্ধ হল ব্রাহ্মণ রাখাল মজুমদার। চলল কালীর উপর রাখালের নির্যাতন। রাখাল তাকে একঘরে পতিত করল। তার ঘরখানি পুড়িয়ে দিল। প্রতিহিংসায় হিংস্র হয়ে উঠল কালী। রাখাল মজুমদারের ঘরে আগুন দিতে গিয়ে সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে দিল সেই আগুন। ফলে রাখাল মজুমদারের তাঁবেদার দলের তাড়ায় সে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করতে বাধ্য হল। চারদিন চাররাত ঘুম ছিল না তার। প্রাণের দায়ে বিতাড়িত হিংস্র শ্বাপদের মতো কেবল ছুটে পালিয়েছে। অবশেষে একটি পোড়ো বাড়ির দোতলার কোঠাঘরে সে আশ্রয় নিল। কিন্তু সেখানেও তাকে নিস্তার দিল না রাখাল

মজুমদারের দল। ওদের সঙ্গে জুটেছে কালীর বহুদিনের মিতে ভূপতি মিস্ত্রী। কালীর আর পালাবার পথ ছিল না। হাতে ছিল শাবল। সেই শাবল সে বসিয়ে দিল ভূপতির মাথায়। কামারের শক্ত হাতের এক ঘায়েই চুরমার হয়ে গেল ভূপতির মাথা। অনেক কষ্টে পুলিশ এই খুনী আসামীকে ধরে বিচারের জন্য চালান দিল।

অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই বিচারের শেষদিন পর্যন্ত তার বন্দিদশা কেটেছে। কখনো মস্তিষ্কবিকৃতির জন্যে হাসপাতালে, কখনো উন্মা-মতার জন্যে সিগ্রিগেশন সেলে। প্রথম অবস্থায় ফাঁসির ভয়ে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করত। ধীরে ধীরে সে-অবস্থা কাটল। তখন কেবল নীরবে কাঁদত। চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ত, ঠোঁট কাঁপত, কিন্তু চেঁচাত না। অবশেষে এল তার জীবনের অন্তিম-পর্ব। বিচারের জন্য আদালতে সিপাহিরা তাকে টেনে নিয়ে যেত বলির পশুর মতো। আদালতে সমস্তক্ষণ অসাড় হয়ে সে শুধু জজ-সাহেবের মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকত। প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর দিত না, যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছিল তার ফাঁসির আদেশ হবে। কিন্তু সে তবু কোনোক্রমে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হোক তার, তবু ফাঁসি যেন না হয়। কিন্তু তাই হল। তার ফাঁসির আদেশ হল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর জন্যে নির্দিষ্ট সেলে তাকে স্থানান্তরিত করা হল। সেখানে সে কেবল মৃদুগুঞ্জনে বিলাপ করত। সে-বিলাপের ভাষা নেই। আদিম ভাষা-হীন মানুষ বোধ হয় মৃত্যুভয়ে অমনি বিলাপ করতো।

কিন্তু মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও ওই দুর্দান্ত পশুমানবটি হঠাৎ এক আশ্চর্য মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর প্রতি করুণা-প্রকাশের একটি অদ্ভুত ব্যবস্থা আছে মানুষের শাস্ত্রে। মৃত্যুর পূর্বে সে কাকে শেষবারের মতো দেখতে চায়, এই প্রশ্ন তাকে

করা হয়, এবং তার অন্তিম প্রার্থনা পূরণের চেষ্টা করা হয়। কালীকে এই প্রশ্ন করা হলে সে দেখতে চাইল বাসিনীকে। পাষাণপুরীর এই দৃশ্যটি স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের অন্তিমদৃশ্যটি স্মরণ করিয়ে দেবে। কিন্তু দুটি কাহিনীর ফলশ্রুতি দুটি বিপরীত কোটিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাসিনীর জন্যেই কালী মরতে বসেছে। কিন্তু এই প্রাণান্তিক পরিণামের জন্য সে একমুহূর্তের জন্যেও বাসিনীকে দায়ী করেনি। জেলে বাসিনীর সঙ্গে কালীর শেষ-সাক্ষাৎ-দৃশ্যটিতে তারাশঙ্কর লিপিকুশলতার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছেন। সেই বর্ণনা এখানে অংশত উদ্ধার করছি :

"বাসিনী ছলছল চোখে কালীর মুখপানে চাহিয়াছিল,—ধীরে ধীরে দীর্ঘ রেখায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু চোখের কোণ হইতে চিবুক পর্যন্ত গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কালী অতি তৃপ্ত হাসি হাসিয়া বাসিনীর একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল, 'বাসিনী'!

একাগ্র দৃষ্টি তার ঐ নারীটির মুখের 'পরে নিবদ্ধ, ওষ্ঠের বেড় ঘেরিয়া নীরব তৃপ্ত হাসি। সে যেন কৃতার্থ হইয়া গেছে।

ঘরের দেয়ালের গায় ঘড়িটা অবিশ্রান্ত টিক্‌টিক্ করিয়া সময় গণিয়া চলিয়াছে। চিরবিচ্ছেদের মুখে দুটি প্রাণী শেষমিলনের আনন্দে নির্বাক। দুজনে যেন দুজনের ছবি অন্তরে অন্তরে অক্ষয় করিয়া লইতেছে, কিম্বা হয়ত শুধু শুধু দুজনে দুজনের মুখপানে চাহিয়া আছে।

সহসা বাসিনী যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, রোদনক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে কহিল,—'ওগো, কিছু বল তুমি!'

কালী চকিতভাবে কহিল,—'ভাল আছিস বাসিনী?'

বাসিনী বিস্মিত নেত্রে লোকটির পানে চাহিল,—এই কি বলিয়া যাওয়ার কথা?

কালী তেমনি পরিতৃপ্ত হাসি হাসিতেছিল। রব নাহি, শুধু অধরের রেখায় রেখায় সে হাসির লেখা পূর্ণবিকশিত।”

জীবনের এই অন্তিম মুহূর্তে ফাঁসির আসামী কালী কামার পশুস্তর থেকে মানবস্তরে উন্নীত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, প্রেমের স্পর্শেই পশু হল মানুষ। ‘ভাল আছিস বাসিনী?’—এই স্বল্পাক্ষর বাক্যটিতে প্রেমিকের কণ্ঠে প্রিয়জনের প্রীতিকামনাই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। যে-নারী তার জীবনে সর্বনাশিনী মূর্তিতে দেখা দিয়ে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, সেই নারীর কল্যাণকামনায় একটি খুনের মামলার আসামী হয়ে উঠেছে অবিস্মরণীয় প্রেমকাহিনীর ট্রাজেডি-করুণ নায়ক। মানুষের অভিশপ্ত বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যেও তারাশঙ্কব চিরদিন মনুষ্যত্বের মহিমা সন্ধান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠে মিলিয়ে তিনি বলেছেন ‘আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়, আনন্দ আছে নিখিলে।/মিথ্যায় ঘেরে ছোট কণাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।’ তুচ্ছকে অসামান্য-করা, অসুন্দরকে সুন্দর-করা এই প্রেমের দৃষ্টিতেই তারাশঙ্কর চিরকালের মহৎ শিল্পী।

॥ ক ॥

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলার কথাসাহিত্যিকগণের মধ্যে তারাশঙ্কর-ই অগ্রগণ্য। জগত্তারিণী পদক, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ইত্যাদির সম্মান তাঁহার প্রতিভার স্বীকৃতি মাত্র। তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত ছিল, এমন কথা কেহ কেহ বলেন। এ বিষয়ে বিতর্ক অবান্তর। নোবেল প্রাইজ কিপলিং পাইয়াছেন, কিন্তু হার্ডি বা টলস্টয় পান নাই। অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ কোটির উপন্যাস লিখিয়াও কোনো কোনো লেখক নোবেল প্রাইজ পাইয়া থাকিলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁহারা মহত্তম তাঁহারা একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা।

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর ॥ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

শিল্পী হিসাবে তাঁহাদের 'কর্মসু কৌশলম্' আখ্যায়িকার মধ্যে একটা অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা সঞ্চার করে, প্রতিটি ছত্রের মধ্যে একটা শাশ্বতিক ধ্বনি অনুরণিত হয়। তাঁহাদের উপন্যাসে ঘটনাবলী সুসম্বদ্ধ, তাহাদের পারম্পর্য আবশ্যিক, চরিত্রাবলীর সহিত ঘটনাচক্র অঙ্গাঙ্গী-ভাবে যুক্ত। সংলাপ স্বতঃস্ফূর্ত, বর্ণনার সহিত বস্তু বাগর্থের ন্যায় সম্পৃক্ত। সমস্ত রচনা অতিপিনদ্ধ অঙ্গবস্ত্রের ন্যায় সৌষম্যে রূপায়িত। তারাশঙ্করের উপন্যাস কী পরিমাণে এই মানের সন্নিহিত হইয়াছে সে প্রশ্নের শেষ উত্তর দিবার সময় বোধ হয় এখনও হয় নাই। বর্তমানে আমরা মাত্র কয়েকটি বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ করিতে পারি।

॥ খ ॥

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের বৈশিষ্ট্য কী এবং কী গুণে তিনি আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্যের পুরোভাগে স্থান পাইয়াছেন তাহা আলোচনার পূর্বে কথাসাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

মানুষ মানুষকে ভালবাসে বলিয়াই কথাসাহিত্যের উৎপত্তি ও সেইজন্যই তাহার জনপ্রিয়তা। কথাসাহিত্যের মাধ্যমে মানুষ তাহার সীমিত জীবনের পরিধি অতিক্রম করিয়া ব্যাপকতর জীবন ও অনুভূতির স্বাদ পায়, তাহার সম্ভাব্য বৃহত্তর জীবনে অন্তত কল্পনার সাহায্যেও প্রবেশ করে, কাংকারিক জীবনে যাহা 'অনাগত' ও 'অনাহত' তাহারই রূপ ও ধ্বনির আভাস পায়।/

নানা দেশ ও নানা যুগে কথাসাহিত্য উদ্‌ভবের মূলে আছে দুইটি প্রেরণা। একটি হইল Discovery of man by man—বৃহত্তর মানবসত্তার সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও তাহার কোনো কোনো অপরিজ্ঞাত দিকের আবিষ্কার। দ্বিতীয়টি হইল মানবচিত্তের একটা চিরন্তন জিজ্ঞাসা। শেলীর শেষ রচনা—তাঁহার অসমাপ্ত কাব্য The Triumph of Life শেষ হইয়াছে একটি প্রশ্নে—'Then, What is Life ?' এ প্রশ্নের কোনো উত্তর শেলী দিতে পারেন নাই, দিবার পূর্বেই তাঁহার সলিল সমাধি ঘটিয়াছে। এ পর্যন্ত কোনো সাহিত্যিকই বোধ হয় এই শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই, কিন্তু এই প্রশ্নই সকলের চিত্ত আলোড়ন করিয়াছে, এবং এই সম্পর্কে তাহাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও চিন্তার সাগর-মন্থন হইতেই সার্থক উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দুইটি প্রেরণাই প্রায় সমস্ত উপন্যাসের মূলে থাকে, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রথমটির, আবার কোনো ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টির প্রাধান্য দেখা যায়। শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে বোধ হয় উভয়েরই

সামঞ্জস্য সাধিত হয়। প্রথম প্রকারকে psychological বা মনস্তত্ত্বভিত্তিক এবং দ্বিতীয় প্রকারকে philosophic বা দর্শনভিত্তিক বলা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, শাস্ত্রবাগীশের দর্শন ও ঔপন্যাসিকের দর্শন ঠিক এক নহে। একজন দর্শন করেন তর্ক ও যুক্তি দিয়া, অপরজন মানবিক অনুভূতি দিয়া।

॥ গ ॥

(অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশে প্রথম যুগে কথাসাহিত্যের বস্তু ছিল বাহ্য ঘটনার বৈচিত্র্য এবং লক্ষ্য ছিল হিতোপদেশ, না হয় রোমান্স অর্থাৎ 'কামনার মোক্ষধাম।' জীবনদর্শন অপেক্ষা চমৎকারের সৃজনই প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রমে পরিবর্তন আসিল। কথাসাহিত্য হইল কেবল মানবচরিত্র ও মানবজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি নহে; সেই অভিজ্ঞতা হইল জীবন অনুসন্ধিৎসু লেখকের কর-ধৃত কম্পিত শিখা বর্তিকা। চিত্ত বিনোদন নহে, মানব-সত্যের সন্ধানই হইল উপন্যাসের লক্ষ্য। বোধ করি, 'বিষবৃক্ষ' হইতে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের এই লক্ষণ প্রকট হইয়াছে।

জীবনসত্যের দুই দিক আছে—একদিকে ইহা ব্যক্তিগত, অপরদিকে ইহা সমাজগত। একদিকে ইহা নায়ক-নায়িকাদের 'মন নেওয়া-দেওয়া' বা অন্যবিধ কোনো সর্বান্তরিক প্রয়াস বা সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত করে এবং তাহারই মাধ্যমে মানবচরিত্রের হৃদয়-গহনে প্রবেশ করিয়া মানবাত্মার গোপনকথা শুনিবার চেষ্টা করে।) আমাদের দেশে অধিকাংশ ঔপন্যাসিক—বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ, বিভূতিভূষণ হইতে অতি-আধুনিক দলের লেখকেরা সেই প্রয়াসই করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার ব্যক্তির জীবনে কোনও অদৃষ্ট-শক্তির লীলা বা নিয়ামক নীতির সন্ধানও করিয়াছেন। নায়ক-

নায়িকা কিম্বা সনাতন ত্রিভুজের (eternal triangle) পাত্রপাত্রী ছাড়া আর সকলেই গৌণ। সমাজ সংসার কেবল একটা পর্টভূমিকা মাত্র। ব্যক্তি কেন্দ্রিকতাই এই জাতীয় উপন্যাসের লক্ষণ।

অপর জাতীয় উপন্যাসের প্রধান বস্তু হইল সমাজজীবন, অর্থাৎ চিরান্দোলিত জীবন প্রবাহের গতি ও প্রকৃতির অনুধাবন। শত সহস্র মানবজীবন উর্মি বা বুদ্বুদের ন্যায় এই প্রবাহের অংশীভূত, প্রবল অব্যক্ত কোনও প্রেরণার তাড়নায় বা দুর্নিরীক্ষ্য কোনও দৈবশক্তির অঙ্গুলি হেলনে তাহারা উঠিতেছে, পড়িতেছে ও বিলীন হইতেছে। এই তরঙ্গসঙ্কুল ফেনোচ্ছল প্রবাহই জীবন। এই প্রবাহের মুখে আমাদের ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা স্নেহমমতা আদর্শ ইত্যাদি খড়কুটার ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। যতই সন্তরণপটু হই না কেন, এই প্রবাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই। যিনি এই প্রবাহের গতি বুঝিয়া উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করিতে পারেন কেবল তিনিই সংসারস্রোতে ভাসিয়া থাকিতে বা অগ্রসর হইতে পারেন।

এই জাতীয় উপন্যাস অর্থাৎ সমাজকেন্দ্রিক উপন্যাস যাহাতে ব্যক্তি জীবন অপেক্ষা বৃহত্তর জীবনের, মানবিক প্রবৃত্তি অপেক্ষা অতি-মানবিক অদম্য প্রভাবের কথাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে সেইরূপ উপন্যাস আমাদের ভাষায় বেশী রচিত হয় নাই; অন্য ভাষাতেও কমই রচিত হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, উপন্যাসে সমাজচিত্র থাকিলেই তাহা সমাজকেন্দ্রিক হয় না; 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে একটা বিশেষ অঞ্চলের খুব সীমাবদ্ধ একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বাহ্য জীবনের একটা আংশিক রেখাচিত্র থাকিলেও তাহা আসলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপন্যাস, রমা-রমেশরই কাহিনী; তাহাতে রীতিমত একটা নৈতিক আদর্শই চিত্রিত হইয়াছে।

বর্তমান কালে আর একদিক দিয়া উপন্যাসের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উপন্যাস এখন আর ঠাকুরমার রূপকথাও নয়, 'কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধ'দের উপকথাও নয়। ইহা এখন বৈজ্ঞানিক মানসের অন্যতম সৃষ্টি। উপন্যাস এখন ব্যক্তিগত রুচি বা পক্ষপাতের সীমা অতিক্রম করিয়াছে; মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সহিত ইহা সুসমঞ্জস। 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি/ঘটে যা তা সব সত্য নহে' —এ কথায় আধুনিক ঔপন্যাসিক সায় দেয় না। 'পাছে সত্য ভ্রষ্ট হই'—ইহাই তাহার আশঙ্কা। We were not made for refuges of lies'—মিথ্যা আর আমাদের আশ্রয় নহে—ইহাই আধুনিক ঔপন্যাসিকের আত্ম-পরিচিতি।

॥ ঘ ॥

তারাশঙ্করের রচনায় আধুনিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ গুণ ও লক্ষণাদি সবই বর্তমান। তবে এই প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি বাস্তবানুসারী হইলেও তাঁহার 'বাস্তবিকতা' বর্তমান যুগের অনেক লেখকের মতো সঙ্কীর্ণ একদেশদর্শী বা সীমিত নহে। ফ্রয়েড প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিকদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া মনোবিকলন বা মনোবিকারের ইতিহাস রচনা তাঁহার 'বাস্তবিকতা'র লক্ষণ নহে। তাঁহার জীবনালেখ্যে কামের স্থান আছে, কিন্তু তাহা ধর্মার্থকামমোক্ষ —পুরুষার্থের এই চতুর্বর্গের অপর তিনটিকে অবলুপ্ত করে নাই। রিরংসাকে যাহারা জীবনের একমাত্র বা প্রধান প্রেরণা বলিয়া মনে করে তাহাদের চিত্তবৃত্তি শুধু অসুস্থ নহে, তাহারা বাস্তবজীবন সম্পর্কে অজ্ঞান-তিমিরান্ধ। তারাশঙ্করের রচনা তাহাদের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা হইতে পারে।

তারাশঙ্কর কেবলমাত্র আধুনিকতাকেই আশ্রয় করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব

অর্জন করেন নাই। শাশ্বত সাহিত্যের অনেক লক্ষণ, মানবজীবন সম্পর্কে উদার দৃষ্টি ও জীবনরহস্য সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তাঁহার উপন্যাসে আছে।) আমার মনে হয় he had the makings of a great novelist—মহৎ উপন্যাসের উপাদান তাঁহার রচনায় আছে। তবে সেই সমস্ত উপাদানের সমবায়ে সর্বত্র সর্বোচ্চ মানের সাহিত্যসৃষ্টিতে তিনি কৃতকার্য হইয়াছেন কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কোনো কোনো উপন্যাসে, যেমন 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় তিনি উপন্যাস-শিল্পী হিসাবে সাফল্যের সর্বোচ্চ গ্রামে পৌঁছিয়াছেন। এই উপন্যাসে মহাকাব্যের পরিধি আছে, এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ—বক্তব্যের অতিক্রান্ত ব্যঞ্জনা আছে। ইহা রূপক বা সাংকেতিক রচনা মাত্র নহে। আবার, তাঁহার কোনো কোনো উপন্যাস পড়িলে মনে হয় যে তিনি মাত্র সমসাময়িক ঘটনার সাংবাদিক, উপন্যাসের কাঁচামাল ছাড়া স্থায়ী সাহিত্যিক সম্পদ আর বিশেষ কিছু তাহাতে নাই।

॥ ৬ ॥

(তারাশঙ্করের উপন্যাসে উত্তর রাঢ়ের (বীরভূমের) গ্রামজীবন সুস্পষ্ট রেখায় রূপায়িত ও সাহিত্যরসে সঞ্জীবিত হইয়াছে একথা সত্য। বোধ হয় অন্য কোনও বাংলা লেখকের রচনায় একটা বিশেষ অঞ্চলের সমাজ ও সামগ্রিক জীবনধারা এত উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয় নাই, এজন্য তাঁহাকে অনেকে আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক বলেন।) কিন্তু ইহাই তাঁহার সাহিত্য-কৃতির যথেষ্ট পরিচয় নহে। কোনো বিশেষ যুগের কোনো বিশেষ অঞ্চলের সামাজিক আলেখ্য-চিত্রণ নহে, সামগ্রিকভাবে জীবন প্রবাহের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধানই তারাশঙ্করের উপন্যাসের উপজীব্য। উত্তর-রাঢ়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক চিত্র

সেই সন্ধানেরই অবলম্বন। এই হিসাবে তিনি E. A. Bennett প্রভৃতি আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবে ওয়েসেক্স্-জীবনের চিত্রকর Thomas Hardyর উপন্যাস তারাশঙ্করের রচনা অপেক্ষা উচ্চগ্রামের। সে সমস্ত উপন্যাসে যে মৌলিক বলিষ্ঠ জীবন-দর্শনের, মানব চরিত্রের গহনলোকে যে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির উদার সহানুভূতির সহিত তীক্ষ্ণ মননের যে সুসংযোগের বাহ্য প্রকৃতির নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও মানবজীবনে তাহার প্রভাবের যে পরিচয় আছে, তারাশঙ্করের রচনায় ঠিক তাহা নাই। Hardy ছিলেন যথার্থ দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, এবং অতুলনীয় শিল্পী। নিজস্ব উপলব্ধি Hardyর উপন্যাসকে ঋষিবাক্যের প্রায় সমতুল করিয়াছে।

(তারাশঙ্করের উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবনের যে চিত্র আছে তৎসম্বন্ধে আর একটা কথা বলা দরকার। এই চিত্রণে কোনও কল্পলোকের রঙ নাই। যে গ্রামজীবন তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী' নহে; 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' ছোট ছোট গ্রামের চিত্র তাঁহার রচনায় বিশেষ নাই; বিভূতিভূষণের মতো তিনি পল্লীজীবনের idyle সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহাকে গ্রামজীবনের চারণ-কবি বলা সঙ্গত নয়। যে গ্রামজীবনের কাহিনী তিনি শুনাইয়াছেন তাহা যেমন বাস্তবিক, তেমনি কঠোর সত্যে ওতঃপ্রোত।) কিন্তু সে জীবনের মধ্যেও যে অনাবিষ্কৃত এক ধরনের মাধুর্য থাকিতে পারে, তাহাতেও যে কাব্যোচিত রস সৃষ্টির উপাদান থাকিতে পারে, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন।

॥ চ ॥

Dickensএর ন্যায় তারাশঙ্কর 'wrote best when his subjects were those of memory and observation'—তিনি

যখন নিজের স্মৃতিভাণ্ডারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের পরিধির মধ্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতেন তখনই তাঁহার রচনা উৎকর্ষের মানে উন্নীত হইত। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যথার্থ 'প্রজাপতি' ছিলেন না, সৃষ্টিধর্মী কল্পনার শক্তিবলে Shakespeare-এর মতো একটা Hamlet বা Calibar, Dostoevskyর মতো একটা Raskolnibor বা Sonia, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো একটা কপালকুণ্ডলা বা শরৎচন্দ্রের মতো একটা কিরণময়ী সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। 'Nurslings of immortality' তিনি অঙ্কন করেন নাই। অতিবাস্তবের নভোমণ্ডল নহে, 'ললিতে কঠোরে' বৈচিত্র্যময়ী, স্নিগ্ধ হিংস্র পুরাতনী নবীনা পৃথিবী তাঁহার ক্ষেত্র।

এই প্রসঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিও তারাশঙ্কর স্ব-ক্ষেত্রের বাহিরে কদাচিৎ উদ্‌ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অতি-আধুনিক কালের নাগরিক জীবনের নব নব জটিলতা, উৎকট রিপুবশিতা, ভদ্রবেশী বর্বরতা, তীব্র অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রাম ইত্যাদি এড়াইয়া চলিয়াছেন, তবুও মাঝে মাঝে এই সমস্ত বিষয়ে যে তিনি আকৃষ্ট হন নাই এমন নহে, কিন্তু যখনি তারাশঙ্কর স্ব-ধর্ম বিস্মৃত হইয়া পরধর্মের চর্চা করিতে গিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার বীণার তারে সুর নামিয়া গিয়াছে, তাঁহার প্রতিভা ব্যাহত হইয়াছে। নবাগত পাশ্চাত্য সভ্যতা 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' যাহাদের চক্ষু ধাঁধাইয়া দেয় নাই, আধুনিকতার মোহ যাহাদের চরিত্রের ঋজুতা ও স্বাভাবিকতা বিকৃত করে নাই, দোষে গুণে জড়িত সেই অকৃত্রিম নরনারীদের জীবনধারা, তাহাদের নানা সমস্যা, সর্বগ্রাসী নগর সভ্যতার সহিত তাহাদের সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীন জীবনের সংঘাত—ইহারই সুচারু চিত্রণ ও তাৎপর্য সন্ধানই তাঁহার স্ব-ক্ষেত্র। তীব্র আবেগ ও গহনচারী

ভাবোচ্ছ্বাসের বিশ্লেষণে যখনই তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই স্বাভাবিকতার অতিক্রম, অতি-নাটকীয়তা প্রভৃতি দোষে দোষী হইয়াছেন। যাহা সাধারণ ও বাস্তবিক, তিনি তাহারই চিত্রকর; যাহা অনন্যসাধারণ অতিবাস্তব, তাহা তারাশঙ্করের স্ব-ক্ষেত্র নহে।)

॥ ছ ॥

তারাশঙ্করের জীবনালেখ্যের পট সুবিস্তৃত ও ইতর-ভদ্র গণ্য-নগণ্য নানা চরিত্রের সমাবেশে জনাকীর্ণ। এই দিক দিয়া দেখিলে Fra Lippo Lippi প্রভৃতি মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় শিল্পীর অনেক রচনার চিত্রকলার সহিত তাঁহার উপন্যাসের শিল্পকলার সাদৃশ্য আছে। হয়ত কয়েকটি চরিত্র মুখ্য, অপরগুলি গৌণ। কিন্তু গৌণ চরিত্রগুলি অপরিহার্য এবং আলেখ্যের সামগ্রিক আবেদন বহুল পরিমাণে তাহাদের চরিত্র ও আচরণ-সাপেক্ষ। পটের মূর্তিগুলি মোটা তুলির বড়ো বড়ো টানে আঁকা 'স্থূল হস্তাবলেপে' অঙ্কিত না হইলেও সূক্ষ্ম রেখাকার্য তাহাতে নাই, নন্দলাল বসু প্রভৃতি শিল্পাচার্যের রীতি নীতি অনুসরণ করেন নাই। খুব নিকটে গিয়া নিরীক্ষণ করিলে এই জাতীয় চিত্রের আবেদন স্পষ্ট হয় না, উপযুক্ত দূরত্ব হইতেই ইহার শিল্পকর্মের মাহাত্ম্য ও বিশাল আবেদন হৃদয়ঙ্গম হয়।)

॥ জ ॥

(যদিও মহাকবি Virgilএর অতুলনীয় কাব্যকলার সহিত তারাশঙ্করের কথাশিল্পের কোনও তুলনা চলে না, তবুও মানবজীবন সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সাদৃশ্য আছে।) ভার্জিলের কাব্যে 'Ilion falling, Rome arising'-এর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তারাশঙ্করের রচনায় উত্তর-রাঢ়ের একটা যুগের, তাহার আদর্শের ও

সমাজ বিন্যাসের শেষ দশা এবং অপর একটা যুগের প্রারম্ভের, অন্য (হয়ত হীনতর) একটা আদর্শের অভ্যুত্থানের ও একটা সামাজিক উপপ্লবের সূচনা কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। হয়ত এ-কাহিনী একটা সাময়িক বিবর্তনের উপাখ্যান মাত্র, কিন্তু মানবজীবনের একটা গভীরতর সত্যের ব্যঞ্জনাও ইহাতে আছে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ইহা অন্যতম লক্ষণ।

বর্ণনার মধ্যে শুধু বিস্তার নহে, উদার অনুভূতি ও ব্যাপক দৃষ্টির পরিচয় থাকায় রচনা মহৎ সাহিত্যের মান স্পর্শ করিয়াছে। ভার্জিলের ন্যায় তারাশঙ্করকেও উদ্দেশ করিয়া বলা যায়—

'Thou that seest universal
Nature moved by universal mind,
Thou majestic in thy sadness
At the doubtful doom of human kind.'

(বাস্তব অনুসারী হইলেও তারাশঙ্করের দুর্লভ সিদ্ধদৃষ্টি ছিল; বহুরূপে যে বাস্তব আমাদের সম্মুখে প্রসারিত তাহার মধ্যে তিনি দুর্জ্ঞেয় এক দৈবশক্তির আভাস প্রত্যক্ষ করিতেন। সেই শক্তির স্বরূপের সংজ্ঞা নির্ণয়ের বা তাহার লীলা ব্যাখ্যা করিবার মত প্রজ্ঞা, এমন কি দুঃসাহসও তাঁহার ছিল না। তিনি চলিত কোন মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার ন্যায় সহৃদয়ের মনোমুকুরে যাহা প্রতিভাত হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত কোনও মতবাদ যে তিনি প্রচারের প্রয়াস করেন নাই, ইহাতেই তাঁহার সাহিত্য ধর্মের অকৃত্রিমতা প্রমাণিত হয়।)

দ্বিতীয়ত, ভার্জিলের মত তিনিও দেখিয়াছেন যে নরকুলের চরম পরিণতি 'নিহিতং গুহায়াং'। সেই গুহার গহন দ্বারে কান পাতিয়া

থাকিলেও স্পষ্ট কিছুই বোঝা যায় না, হয়ত-বা শোনা যায় একটি গভীর আর্তির অস্ফুট ধ্বনি। সাহিত্যিক ঋষি নহেন ; তাঁহার জীবন সমীক্ষার শেষ কথা—

'Thou ailest here and here'

—এইখানে তোমার বেদনা ও ব্যর্থতা। তবে এই বিষাদের মধ্যেও মানবের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের উপলব্ধি ও তজ্জন্য একটা মর্যাদাবোধ উভয়েরই ছিল। তারাশঙ্কর যেখানে লোকশিক্ষার প্রয়াস করেন নাই সেখানে তাঁহার সাহিত্যকর্মের অন্তরে ঐ কথাই ধ্বনিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। (তরুণ বয়স হইতে তারাশঙ্কর ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী এবং সেই যুগে রাজনীতির লক্ষ্য ছিল শুধু রাষ্ট্রবিপ্লব নহে, লোকজীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন।) মহাত্মা গান্ধী ছিলেন তখন কর্মযোগের আদর্শ, সংখ্যালঘু ও হরিজনদিগের জীবন ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা তখন প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীর হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তারাশঙ্করের উপন্যাসের বস্তু ও প্রবণতা বহুল পরিমাণে তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। মুক্তিই ছিল তাঁহার জীবনাদর্শ। জনসাধারণের রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য ঐকান্তিক আগ্রহই ছিল তাঁহার কর্মজীবনের তথা সাহিত্যকর্মের প্রেরণা।

তবে এই মুক্তি শাস্ত্রোক্ত জীবনমুক্তি নহে, এবং তাঁহার উপন্যাসের মহত্তর চরিত্রদের মুক্ত পুরুষ বলা যায় না। এমন কি রবীন্দ্রনাথের গদ্যে পদ্যে যে মুক্তির আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে ঠিক সে আদর্শও তারাশঙ্করের রচনায় নাই। তারাশংকর মাটির মানুষ, ভূর্লোকই তাঁহার স্থান ;) ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সচ্ছন্দগতি দেবর্ষি তিনি নহেন।

॥ খ ॥

(যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চিত্র তারাশঙ্করের উপন্যাসে বিধৃত হইয়াছে, তিনি নিজেই ছিলেন তাহার অঙ্গীভূত এবং বোধ হয় সেইজন্যই তাঁহার আলেখ্য এত সমৃদ্ধ ও সুস্পষ্ট হইয়াছে।) এই সমাজ ছিল ভূস্বামীকেন্দ্রিক; ইহাকে শুধু দরিদ্র বঞ্চিত কৃষক ও শ্রমিক কুলের শোষণযন্ত্র বলিয়া বর্ণনা অনেকে করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যার মধ্যে যে সত্য নাই এমন নহে। কিন্তু তারাশঙ্করের দৃষ্টি ব্যাপকতর ও গভীরতর। যাঁহাদের শুধু শোষক, উৎপীড়ক ও ব্যসনবিলাসী বলা হইয়াছে তাঁহাদের অনেকের জীবনে ও চরিত্রে যে অতীত যুগের গৌরব, আদর্শপরায়ণতা ও ধর্মনিষ্ঠা অন্তত কিয়ৎ পরিমাণেও বাঁচিয়া ছিল, গ্রামীণ জীবনের উৎসব আনন্দ পার্বণ ও বিদ্যাচর্চার যে তাঁহারা ছিলেন পোষক ও প্রেরণার উৎস, এবং সময়বিশেষে গরীবের মা-বাপ—তাহাও তারাশঙ্কর লক্ষ্য করিয়াছেন।) নিম্নশ্রেণীর শ্রম ও শোষণপুষ্ট এই ভদ্র ভূস্বামীদের শুধু পরগাছা মনে করা উচিত হইবে না। তাঁহাদের অনেকের জীবনে গভীরতা ও মহত্ত্ব ছিল। তাঁহাদের উৎসাদনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অন্যায় অবিচারের যেমন লোপ হইয়াছে তেমনি প্রাচীনকালের জীবনাদর্শ, সামাজিক শৃঙ্খলা ও সুস্থিরতাও অবলুপ্ত হইয়াছে। এখন শুধু আছে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত এবং সমাজজীবনের শৃঙ্খলা। (তারাশঙ্করের দৃষ্টি মোটেই পক্ষপাতদুষ্ট নহে। তাঁহার মত অনেক দৈত্যকুল-প্রহ্লাদ প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ভাঙিয়া গড়িবার প্রয়াস করিয়াছেন। ভূস্বামীদের চরিত্রের নানাদিক ও নানা সমস্যার সহিত তারাশঙ্করের পরিচয় ছিল; তিনি তাঁহাদের দুর্বলতা দোষ ক্রুটির সহিত, তাঁহাদের চরিত্রের অন্তর্লীন শক্তি ও নিষ্ঠারও পরিচয় দিয়াছেন; উজ্জ্বল ও অন্ধকার কোনো দিকই তাঁহার অগোচর ছিল না।)

(তবে তিনি দেখাইয়াছেন প্রাচীন ব্যবস্থা এখন ভঙ্গুর; প্রাচীন ঐতিহ্য, আচার ও নিষ্ঠা এখন অচল; কারণ আধুনিক যুগের বাস্তব সত্যের উপর তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায়ই ছিল তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি; তিনিও মনে করিতেন যে, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্য হইতেই নবীন তেজস্বী ভারতের আবির্ভাব হইবে।) কিন্তু শুধু দ্বান্দ্বিকতায় বিশ্বাসী মতবাদী তিনি ছিলেন না। তাঁহার অন্তর ছিল উদার সহানুভূতিতে পূর্ণ, সেইজন্যই তিনি সার্থক, বাস্তব ও সত্য সমাজচিত্র অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন। শ্রেণীগত জীবন নয়, ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যময় মানবচরিত্রই ছিল তাঁহার রচনার উপকরণ।

॥ এঃ ॥

(তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর নরনারীর চরিত্র অঙ্কনেই বোধ হয় তারাশঙ্করের কৃতিত্ব সমধিক। তাহারা উচ্চ শ্রেণীর দ্বারা নানাভাবে নিপীড়িত, নিঃস্ব, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইত্যাদি অনেকেই বলিয়াছেন এবং তদনুরূপ জীবনও অনেক সাহিত্যিক চিত্রণ করিয়াছেন।) তারাশঙ্করের উপন্যাসেও এই সমস্তই স্বীকৃত ও অঙ্কিত হইলেও আরও কিছু তিনি নিম্নশ্রেণীর জীবনে ও চরিত্রে আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই শ্রেণীর অনেকের মধ্যে একটা গূঢ় আত্মিক শক্তি আছে; সভ্যতার সংক্রমণ হইতে তাহারা মুক্ত বলিয়াই তাহাদের বাক্যে ও ব্যবহারে অকৃত্রিমতা ও আন্তরিকতা নষ্ট হয় নাই। একেবারে 'মাটির কাছাকাছি' আছে বলিয়াই পৃথিবীর নাড়ীর স্পন্দন, তাহার 'অট্ট বিদ্রূপ' ইহারা কিছু কিছু শুনিতে পায়। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় বৃদ্ধা সুচাঁদ ইহাদের অন্যতম। লোকচক্ষে ইহারা অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত, অনেক সময়ে অর্ধোন্মাদ। কিন্তু যেমন উন্মাদ অবস্থায় King Lear-এর চিত্তে জীবনের গূঢ়

সত্যের ছায়া পড়িত, তদ্রূপ ইহাদের অশিক্ষিত এবং আধুনিকতার মোহমুক্ত অন্তঃকরণে অনেক সৃষ্টি রহস্য প্রতিভাত হয়।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে বিচার করিলে ইহাদের চরিত্রে অনেক দোষ পরিলক্ষিত হইবে। আত্মসংযম ইহাদের নাই, হয়ত তাহার আবশ্যকতাও ইহারা বোধ করে না; ও প্রবৃত্তিই ইহাদের পরিচালিত করে, সামাজিক বিধিনিষেধ ইহারা গ্রাহ্য করে না।

এই উপলক্ষে ইহাদের চরিত্রে আর একটা দিক লক্ষণীয়। ইহারা সময়ে সময়ে অসংযত আচরণ করিলেও ইহারা মুখ্যত বিদ্রোহী নহে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে তাহারা চিরন্তন বলিয়া মনে করে, এবং যাহা-কিছু অঘটন ঘটে তাহাকে বিধাতার অমোঘ দণ্ড বলিয়া মাথা পাতিয়া লয়, 'ইন্‌কিলাব' ইহাদের আকর্ষণ করে না।

তারাশঙ্কর 'অখ্যাত জনের নির্বাক মনের' সার্থক চিত্রকর। 'শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ' সে কথার মর্ম তাঁহার উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন

কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন'—তারাশঙ্কর সেই 'জন'।

এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। যে সমস্ত চরিত্রের অঙ্কনে তারাশঙ্কর সর্বাধিক মৌলিকতা দেখাইয়াছেন তাহারা অনেকেই সমাজের প্রত্যন্ত-নিবাসী। বর্ণাশ্রমের কাঠামোর মধ্যে তাহাদের স্থান নির্দেশ করা দুরূহ। সমাজ-নির্দিষ্ট কোনো কুলকর্ম তাহাদের নাই। তাহারা প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতার সহিত কোনও সম্পর্ক রাখে না, জীবনস্রোতে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়ায়, কিন্তু ইহাদের জীবনে আমাদের আগোচর একটা সূত্র এবং অপরিচিত রস থাকিতে পারে। তারাশঙ্কর তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন।

এতদ্‌ভিন্ন তারাশঙ্করের উপন্যাসে আর এক জাতীয় চরিত্রের সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তাহারাও এক হিসাবে সমাজ-বহির্ভূত। ইহারা হয়ত কোনরূপ গুহ্য ধর্ম বা আচার পালন করে। তারাশঙ্কর নিজে যে দীক্ষিত তান্ত্রিক, বৈষ্ণব বা সহজিয়া সাধক ছিলেন তাহা নহে, তবে এই জাতীয় সাধন মার্গের নানা পথিক যে আছে তাহা তিনি জানিতেন। তাহাদের মধ্যে কেহ ভ্রান্ত, কেহ উদ্‌ভ্রান্ত; কেহ সিদ্ধ, কেহ বা সিদ্ধাই-লিপ্সু। তাহাদের জীবনে যে আমাদের বুদ্ধির অগ্রাহ্য মহিমা বা রস থাকিতে পারে সে বিষয়ে তারাশঙ্করের সন্দেহ নাই। Macbeth নাটকে ডাইনীরা যেমন একটা অজ্ঞেয় মহাশক্তির সহিত সম্পৃক্ত, ইহারাও সম্ভবত তদ্রূপ। যাহা হউক, তারাশঙ্করের উপন্যাসের আনাচে-কানাচে ইহাদের উপস্থিতি তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে একটা নূতন মাত্রার (dimension) নির্দেশ দিয়াছে, এবং একটা রহস্যময় ব্যঞ্জনার সঞ্চার করিয়াছে। তারাশঙ্করের অনেক ছোট গল্পে যে অতি-প্রাকৃতের কথা আছে তাহা লৌকিক বিশ্বাস হইতে আহৃত। অযৌক্তিক বা কাল্পনিক, যাহাই তাহাকে বলা হউক না কেন, তাহাতে প্রাকৃতের মধ্যে অতি-প্রাকৃতের আবির্ভাবের সম্ভাবনা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এই অতি-প্রাকৃত সম্পর্কে তারাশঙ্করের স্পষ্ট কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, তবে ইহার ছায়া কখনো কখনো তাঁহার গোচর হইয়া থাকিবে।

॥ ট ॥

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তারাশঙ্করের রচনাবলী একটা বিরাট সামাজিক উপপ্লবের ইতিহাস। বহু প্রকারের বহু চরিত্র তাঁহার উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে। সকলকে লইয়া সমাজের একটা গোটা প্রস্থচ্ছেদ (cross-section) আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

তাঁহারা অনেকেই বিভিন্ন শ্রেণী গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় ; নানা স্বার্থ, নানা রাগ বিরাগ আবেগ, নানা সংস্কার, নানা অন্ধ-বিশ্বাসের তাহারা পরবশ। নানা স্তরের ধারণা ও আদর্শের তাহারা প্রতীক। এই সমস্ত ব্যক্তির ও তাহাদের প্রবৃত্তির পারম্পরিক প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া একটা বিরাট সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাঙাগড়া চলিতেছে। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব তথা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং প্রাচীন ও নবীনের জীবনাদর্শের মধ্যে সংঘাত এই ভাঙাগড়ারই একটা দিক মাত্র। এই উপপ্লবের চাপ ও প্রভাব সর্বাধিক দেখা যায় তরুণ শিক্ষিতদের মনে ও আচরণে। তারাশঙ্কর নিজেও এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

তিনি দেখাইয়াছেন যে তাসের প্রাসাদের মতো পুরাতন ব্যবস্থা, ধারণা এমন কি আদর্শ ভাঙিয়া পড়িতেছে। তবে সবই যে ধূলিসাৎ হইতেছে তাহা তারাশংকর মনে করেন না, পাগলা মেহের আলির মত 'সব ঝুট হ্যায়' ইহাই তাঁহার বাণী নয়। যাহা মিথ্যা বা সময়োপযোগী মাত্র তাহা যতই বর্ণাঢ্য হউক তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যাহা সত্য তাহাই সনাতন, তাহাই টিকিয়া থাকিবে। মানবজীবনে ব্যর্থতা আছে, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস আছে ; আশা আকাজ্ক্ষা মৃৎ পাত্রের ন্যায় ভাঙিয়া যায়। তবু সেই ভগ্নশেষের মধ্য হইতে নবজীবনের সূচনা হয়, অমানিশার শেষে আলোকরশ্মি দেখা দেয়।

সুতরাং তারাশঙ্কর বাস্তবানুসারী হইলেও তাঁহার জীবন-দর্শনের শেষ কথা—আস্তিক্যবাদ। তবে সে আস্তিকতা Browning-এর আত্মপ্রত্যয়নিষ্ঠ আস্তিকতা নহে। তিনি প্রত্যক্ষ জীবনসত্যই সমীক্ষণ করিয়াছেন, দেখিয়াছেন যে সৃষ্টির মধ্যেই ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে, মৃত্যু সর্বদা ক্রূর প্রেতের ন্যায় অলক্ষিতে

জীবনের অনুধাবন করিতেছে।) Swinburn-এর মতো তিনিও দেখিয়াছেন—

Night, the shadow of light
And Life, the shadow of death.

জীবন ধরিয়া চলিতেছে—

দুই দেবতার দ্যূত খেলা অনিবার
ভাঙাগড়াময়।

ইহার শেষ কোথায়?

বস্তুনিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ইহার কোনো সদুত্তর দিতে পারেন না। তবে একটা যে প্রবল দৈবশক্তি সমস্ত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে, সেই শক্তি যে 'অজানা হইতে অজানা'র দিকে মানুষ ও মানুষের সমাজকে মহাস্রোতে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহা তিনি মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সে অজানালোক 'অতল আঁধারে' মগ্ন নহে, 'অকূল আলোকে' উজ্জ্বল। সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিচার এ সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। তারাশঙ্কর ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবহমান এক বৃত্তি অথবা স্বজ্ঞার বলে। সাধারণ লোকের মনেও এই বিশ্বাসের আবির্ভাব হয়; কখনও ধর্মবিশ্বাস, কখনও সংস্কার এমন কি কুসংস্কারের বেশেও ইহা দেখা দেয়। তারাশঙ্কর অবশ্য বৈদিক ঋষিদের ন্যায় কখনই উচ্চ কণ্ঠে বলিতে পারেন নাই—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য বর্ণং
তমসঃ পরস্তাৎ।

'আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়।'

তারাশঙ্কর শুধু বলিতে পারেন—
'পেয়েছি আভাস আমি
পাইনি সন্ধান তার।'

॥ ঠ ॥

তারাশঙ্কর সম্বন্ধে সব কথা এই প্রবন্ধের পরিসরে বলা সম্ভব হইল না। তাঁহার কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি, তাঁহার উপন্যাসের ঘটনাচক্রে (plot) দুর্বলতা, সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের সহিত তাঁহার তুলনা ইত্যাদি অনেক বিষয়ই বাদ পড়িয়া গেল। পরিশেষে শুধু বলিতে চাই যে, তারাশঙ্কর বাস্তবানুসারী হইলেও বস্তুতান্ত্রিক এমন কি বস্তুবাদীও ছিলেন না। বাস্তবের বাহ্য দৃশ্যই তাঁহার নিরীক্ষার সীমা নির্দেশ করিত না, 'আগে কহ আর' এই জিজ্ঞাসা তাঁহার মনে প্রবল ছিল। তিনি অস্তিবাদী হইলেও চলিত ধর্মমত নির্বিচারে মানিয়া লন নাই; মহত্তর জীবনাদর্শের সন্ধান করিলেও তিনি কখনও বাস্তব-সত্যকে লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি দুঃখবাদী বা মন্দগ্রাহী (cynic) ছিলেন না। তিনি ছিলেন সত্যান্বেষী, আতত-দৃষ্টি, বস্তুনিষ্ঠ, উদারহৃদয়, জীবনরসিক ও যথার্থ সাহিত্যিক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকে লেখা হলেও নানা কারণে একটি বিশিষ্ট রচনা। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩৪৬ সালের আশ্বিন মাস (অক্টোবর ১৯৩৯)। পরে এই গ্রন্থটির অনেকগুলি মুদ্রণ হয়েছে। সাধারণত তারাশঙ্কর কোনো গ্রন্থের সংস্করণের সময় এতো বেশী সংস্কার সাধন করেন যে অনেক সময় সেই গ্রন্থ প্রায় নূতনভাবে লিখিত বলে মনে হয়। নিজের রচনা সম্পর্কে এই অতৃপ্তি ও অস্থিরতাবোধ তারাশঙ্করের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'ধাত্রীদেবতা' এর এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হওয়ায় মনে হয় তারাশঙ্করের মর্মব্যথা এর মধ্যে এমন গভীর ও বিশ্বস্তভাবে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ধাত্রীদেবতা

সুশীলকুমার গুপ্ত

ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি এর সংস্কার সাধনে অগ্রসর হননি। এই দিক দিয়ে 'ধাত্রীদেবতা' তাঁর অন্তর্জীবনের এক মূল্যবান দলিল।

তারাশঙ্কর তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভর করেছেন। সমসাময়িক ঘটনা ও পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর মন যথেষ্ট সচেতন হলেও তিনি বাঙলা তথা ভারতের ঐতিহ্য আদর্শ ও নীতির বিষয়ে গভীরভাবে বিশ্বাসী ও মমত্ববোধ সম্পন্ন। এই দিক দিয়ে তাঁর সবচেয়ে সমধর্মিতা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে। তারপর যাঁদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা দেখা যায় তাঁরা হলেন মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। তারাশঙ্করের রচনার প্রচণ্ড গতিশীলতা,

দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তা অনেক ক্ষেত্রে মধুসূদনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রথম জীবনে রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ থাকলেও তিনি তাঁর রচনায় বিশেষ প্রেরণা লাভ করেছেন প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার ও ঐতিহ্য এবং নূতন যুগের সঙ্গে সেগুলির নূতন সংঘাত ও মূল্যবোধের কাছে। সেই জন্যে নগরজীবন তাঁর সাহিত্যে স্থান পেলেও গ্রাম্যজীবনের কথকতায় তাঁর স্ফূর্তি সবচেয়ে বেশী। বস্তুত গ্রাম্যজীবন—তার সবলতা ও দুর্বলতা, নিষ্ঠুরতা ও মমতা, ন্যায় ও অন্যায়, কাব্য ও অকাব্য, নীতি ও দুর্নীতি নিয়ে তাঁর রচনায় আশ্চর্য আন্তরিকতা ও উজ্জ্বলতায় ফুটে উঠেছে। তাঁর মন বিশেষভাবে বাঙলা দেশীয় তথা ভারতীয়। পাশ্চাত্য বিপ্লববাদের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি পড়াশুনা ও আলোচনা করলেও তাঁর মনের গতি চিরকালই প্রাচ্যাভিমুখী ছিল। এইখানেই, 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' প্রভৃতি গোষ্ঠির প্রতিনিধি স্থানীয় লেখকদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ প্রভেদ। তিনি বিশেষভাবে প্রেরণা লাভ করেছেন গান্ধীজীর গণ-আন্দোলন, বুদ্ধের অহিংসানীতি, শাক্ত বৈষ্ণব দর্শন প্রভৃতি থেকে। তাঁর অভিজ্ঞতায় রাঢ় অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ধৃত হয়েছে শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্ব ; মৃত্যুজিজ্ঞাসা সামন্ততন্ত্রের ক্ষয় ও নূতন যুগের সঙ্গে তার সংঘর্ষ ; ব্রাহ্মণ্য মহিমাবোধ, বেদে, কবিয়াল প্রভৃতি নানা অবহেলিত জীবনের রোমাঞ্চকরতা, রহস্যময়তা গতিময়তা প্রভৃতি। এর সঙ্গে মিশেছে সমসাময়িক কালের গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নেতাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ স্বদেশপ্রেম, বাঙলার বিপ্লববাদ ও তার সংশয়ময় পরিণতি প্রভৃতি। 'আমার সাহিত্য-জীবন' গ্রন্থে তারাশঙ্কর তাঁর 'চৈতালী ঘূর্ণি'র উৎসর্গ করার প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বইখানি উৎসর্গ করলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে। বাঙলার যৌবনশক্তির প্রতীক। নবযুগের অগ্রদূত। শুধু তাই নয়,

আগেই বলেছি এই সময় তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।" কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে যখন তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক জীবনাবেগই প্রবল ছিল, তখন বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচীর সঙ্গে আলাপ হওয়ার ফলে তাঁর মধ্যে পরাধীন দেশকে বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্ত করবার প্রচণ্ড সংকল্প জাগরিত হয়। কিন্তু তিনি কোনো দিনই দলের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন নি। সেই জন্যেই হয়তো তাঁর জীবনে সশস্ত্র বিপ্লবের নেশা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তাছাড়া সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতা তাঁর মনে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শসঞ্জাত রোমান্টিক ভাবনা ও চিন্তা তাঁর কবিপ্রবণ আবেগময় মনকে গভীর প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করেছিল। বস্তুত তাঁর মধ্যে একটা হৃদয়নির্ভর মানবতাবোধ-সম্পন্ন দেশপ্রেমই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। পরবর্তীকালে সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতির প্রসঙ্গে আগ্রহী হলেও সে সব কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে নি। সনাতন আদর্শগত পাপপুণ্য বোধ, আস্তিক্য চিন্তা, অধ্যাত্মানুভূতি, ন্যায়ান্যায় ধারণা, মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনবোধ, প্রভৃতির আশ্রয়েই তাঁর মানবপ্রেম ও দেশাত্মবোধ লালিত হয়েছে।

উপরে তারাশঙ্করের যে মানসিকতার কথা বলা হল সেটি মনে রেখে তাঁর গল্প ও উপন্যাস পাঠ করলে দুটি ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'রসকলি' 'কবি', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' 'রাধা' ইত্যাদি রচনার মধ্যে দিয়ে একটি ধারা বয়ে চলেছে। অন্যধারার অস্তিত্ব রয়েছে 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'আগুন,' 'ধাত্রীদেবতা,' 'কালিন্দী,' 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', ইত্যাদির মধ্যে। প্রথম ধারার মধ্যে তিনি দেশের ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, বেদে, ডোম, কবিয়াল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভক্তি-

প্রবণতা, প্রেম, লোভ ইত্যাদি নানা হৃদয়বৃত্তির রূপায়নে অধিকতর আগ্রহী হয়েছেন। অন্য ধারার মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তা, সমাজ সংস্কারে আগ্রহ, পুরাতন ভাবাদর্শের সঙ্গে নবযুগের সংঘাত ও সমন্বয়ের ভাবনা অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। বলা বাহুল্য একটি ধারা অপরটির পরিপূরক এবং দুটির মিলনেই তারাশঙ্করের সৃষ্টির বৈচিত্র্য রম্যতা ও ব্যাপ্তি।

পূর্বেই বলেছি 'ধাত্রীদেবতা' তারাশঙ্করের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিতে'র মতো এর মধ্যে তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন ছায়া ফেলেছে। মধ্যযুগের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী একটি জমিদার পরিবারের জীবনে নূতন যুগের ভাবাদর্শের সংঘাত ও সমন্বয় প্রচেষ্টা 'ধাত্রী-দেবতার' মধ্যে লক্ষণীয়। এখানে শিবনাথ নামে একটি জমিদার-তনয়ের শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত নানা ঘটনা পঁয়ত্রিশটি অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। লাঘাটা বন্দরের বাঁড়ুজ্জে বাড়ির সাত আনির মালিক স্বর্গত কৃষ্ণদাসবাবুর পুত্র শিবনাথের শৈশব ও কৈশোর মা ও পিসীমা এই দুই ব্যক্তিত্বের পরস্পর বিরোধী, আবার কতকটা সমন্বয়ী প্রভাবের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। একদিকে পিসীমা শৈলজা ঠাকুরানী শিবনাথকে জমিদারের আভিজাত্য বোধ, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও শ্রেষ্ঠত্ব চিন্তা, বংশ পরম্পরাগত জাত্যাভিমান প্রভৃতির দিকে প্রচণ্ড-ভাবে টানতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তাঁর মা জ্যোতির্ময়ী তাঁর হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম, মানবতাবোধ ও জনসেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছেন। প্রথম দিকে পিসীমার ব্যক্তিত্বের প্রভাব জয়ী হলেও শিবনাথের উপর মায়ের প্রভাবই অধিকতর কার্যকরী হয়েছে। শৈশবের নেকড়ের বাচ্চা ধরা, যুদ্ধাভিনয়ের আগ্রহ, ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদিতে ব্যক্ত জমিদারসুলভ দুরন্ত ও দুঃসাহসী মনোভাব ক্রমে

মায়ের প্রভাবে তাকে জনসেবার কঠোর সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে। তার গ্রামে মহামারীর সময়ে জনসেবার সূত্রে তাঁর পরিচয় ঘটেছে সুশীল ও পূর্ণর সঙ্গে। তারাই তাকে নিয়ে গেছে কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় সন্ত্রাসবাদের দিকে। একদিন পূর্ণর সঙ্গে সাঁওতাল পরগনায় বিপ্লবী দলের একজন নেতার কাছে গিয়ে পূর্ণ ও ঐ নেতার কথাবার্তার মধ্যে সন্ত্রাসবাদের অপূর্ণতা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পরিশেষে তার সামনে পূর্ণর হাতে ঐ সন্ত্রাসবাদে আস্থাহীন নেতার মৃত্যু তাকে সন্ত্রাসবাদের পথ থেকে অহিংস আন্দোলনের পথে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে তার পারিবারিক জীবনে দ্বন্দ্ব চলেছে পত্নী গৌরীকে কেন্দ্র করে। গৌরী পিসীমার কর্তৃত্ব সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ি চলে গেছে। গৌরীর মামা রামকিঙ্করবাবু, দিদিমা এবং তার ভাই শিবনাথের সহপাঠী কমলেশের প্রভাবে শিবনাথ ও গৌরীর সম্পর্ক বিষিয়ে উঠেছে। মহাযুদ্ধের যে সময়ে সুশীল তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে দেশের মুক্তিসংগ্রামের সুবর্ণ সুযোগ বলে, সেই সময়ে রামকিঙ্করবাবু ও কমলেশ ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থের উপায় করে শিবনাথকে তাদের ব্যবসায়ে টানতে চেয়েছে। অর্থাভাবে তার সম্পত্তি যখন হাতছাড়া হওয়ার মতো হয়েছে তখন শ্বশুরবাড়ির দম্ভোক্তি ও অবহেলা তার মধ্যে এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। গ্রামে জ্যোতির্ময়ীর মৃত্যু উপলক্ষ্য করে গৌরীর সঙ্গে শিবনাথ ও পিসীমার সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। জ্যোতির্ময়ীর মৃত্যুর পর পিসীমা গৌরীর হাতে সংসারের ভার দিয়ে কাশী চলে গেছেন। আবার সংসারের দারিদ্র্য নিয়ে শিবনাথ ও গৌরীর মধ্যে বিরোধ ঘটেছে। গৌরী মামার কাছে চলে গেছে। বাল্যাবধি শিবনাথের উপর মা ও পিসীমা ছাড়া আর যে দুজনের প্রভাব সবচেয়ে বেশী ছিল তাঁরা হলেন মাস্টারমশাই রামরতনবাবু

ও গোঁসাইবাবা। রামরতনবাবু নিজের সম্পত্তি বাঁধা রেখে টাকা সংগ্রহ করে শিবনাথের জমিদারি বাঁচিয়েছেন। আর গোঁসাইবাবার হাতে জমিদারির চাবিগোছাটি তুলে দিয়ে শিবনাথ অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শেষ কালে শিবনাথ গ্রেপ্তার হয়েছে। খবর পেয়ে শিশুপুত্র সহ গৌরী গ্রামে ফিরেছে কমলেশের সঙ্গে। কমলেশ ঠিক করেছে শিবনাথকে দিয়ে বণ্ড লিখিয়ে তাকে মুক্ত করবে! পিসীমাও ফিরে এসেছেন। পিসীমা ও গৌরী কেউ রাজী হলেন না যে শিবনাথ বণ্ড লিখে মুক্ত হোক। তিনি ও পুত্রসহ গৌরীকে শেষ পরিচ্ছেদে জেলের দরজায় দেখা গেল। শিবনাথ লোহার দরজার ওদিকে আর এদিকে পিসীমা, গৌরী ও তার শিশু পুত্র। পিসীমার কাছে ইষ্টদেবতা গোপাল ও শিবু এক হয়ে গেল। তিনি বললেন, "আমি ভার নিলাম শিবু, তুই ভাবিস নি। ওরা আমার বুকেই রইল।" গ্রন্থের সর্বশেষ অংশটি তারাশঙ্করের ভাষাতেই পড়া যাক—

"পিছন হইতে জেলার বলিল, 'সময় হয়ে গেছে শিবনাথবাবু।'"

জানালার চৌকাঠে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া শিবু বলিল, 'এখান থেকেই প্রণাম করছি পিসীমা।' মনে মনে সে বলিল, সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বাস্তু; সেই বাস্তুর মূর্তিমতী তুমি, তোমাকে যে বাস্তুর কল্যাণ করতেই হবে। এই তো তোমার ধর্ম। তুমিই তো আমায় বাস্তুকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে। আশীর্বাদ কর, ধরিত্রীকে চিনে যেন তোমায় চেনা শেষ করতে পারি।

প্রদীপ্ত হাসিমুখে পরিপূর্ণ অন্তরে শিবনাথ ফিরিল। গৌরীর অবগুণ্ঠন তখন খসিয়া গিয়াছে, অনাবৃত মুখে, পূর্ণদৃষ্টিতে সে ওই দিকে চাহিয়াছিল। পিসীমা তাহার মাথায় অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া ডাকিলেন, 'বউমা, খোকা ডাকছে তোমাকে।'

ওদিকে লোহার দরজাটা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।" এখানে পুরনোর অবসান এবং নূতনের প্রকাশের জন্য আমরা নবজীবনের দ্বারোদ্‌ঘাটনের প্রতীক্ষায় থাকি।

উপরে শিবনাথের চিন্তার মধ্যে 'ধাত্রীদেবতা' কে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ধরিত্রী জাতির মধ্যে দেশ, মানুষের কাছে বাস্তু আর এই বাস্তুর মূর্তিমতী পিসীমা—তিনিই তো ধাত্রীদেবতা। তারাশঙ্কর মানব সমাজ ও সেই সঙ্গে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী। তাই তিনি সমস্ত অশুভ ও অন্যায়ের শেষে এক কল্যাণের রূপ দেখতে পান। তাঁর শুভবোধ, অধ্যাত্মানুভূতি ও সত্যচিন্তায় তিনি অতীত ও বর্তমানের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। মা ও বাবার মধ্যে তিনি তাঁর এই বিশিষ্ট অনুভূতির সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। 'আমার কালের কথা'য় তিনি লিখেছেন, "অনন্তের ধ্যানে সমাধিস্থ, অর্ধনিমীলিত চক্ষু, হিমশীতল দেহ আমার বাবা আমার কালের অর্ধাঙ্গ : আমার জ্যোতির্ময় প্রদীপ্ত দৃষ্টি শুভ্রবাস পরিহিতা তেজস্বিনী মা আমার কালের অপর অর্ধাঙ্গ : আমার জীবনে আমার কাল সাক্ষাৎ অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে প্রকটিত। তাই আমার সেকাল আর একালের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। চির কল্যাণের একটি ধারা তার মধ্যে দেখতে পাই।" কালের এই বিশিষ্ট ধারণার মধ্যে তারাশঙ্করের শাক্ততন্ত্র-সম্মত মনের পরিচয় পরিস্ফুট। বাবা ও মায়ের রূপ বর্ণনা শিব ও দুর্গার মূর্তিকে মনে করিয়ে দেয়। তার মৃত্যুচিন্তা এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমরতাকে পাবার আকূতিও এই কালধারণা থেকে উৎসারিত।

'ধাত্রীদেবতার' পিসীমার নানা পরিচয় রয়েছে 'আমার কালের কথার' মধ্যে। তিনি লিখেছেন, "এক পিসীমা একই দিনে কলেরায়

স্বামী-পুত্রকে হারিয়ে ঘরে এসেছেন।" অন্যত্র তাঁর উক্তি, "পিসীমা শৈলজা দেবী আগুনের মত উত্তপ্ত। আমিই ছিলাম সেই উত্তাপে জল। প্রথম জীবনে বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সে একই দিনে কলেরায় স্বামীপুত্র হারিয়ে পিত্রালয়ে এসেছিলেন;···আমি যখন জন্মালাম, তখন তিনি মায়ের কোল থেকে আমাকে নিয়ে পালন করতে আরম্ভ করলেন এবং জীবনের উত্তাপও কমে আসতে আরম্ভ হল।"

মায়ের সম্বন্ধে তাঁর উক্তি, "তিনি অসাধারণ একটি মেয়ে। প্রতিভাময়ী। তিনি এসেই আমাদের সংসারকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তখনকার দিনে আমাদের গ্রামে প্রবহমান যে কাল তাকে পিছনে রেখে অনেক দূরে।···পনেরো বছরের মেয়েটি বাড়ীতে পা দেবা মাত্র গোটা বাড়ীটার চেহারা ফিরে গেল. বাবার সমস্ত ঔদ্ধত্য মহিমাময় গাম্ভীর্যে পরিণত হল; পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে তিনি যেন শান্ত হয়ে সাধনামগ্ন হলেন। কৌলিক এবং দেশের মাটির যে সাধনা ও ঐতিহ্য রক্তের মধ্যে মানুষ বহন করে, তাঁর মধ্যে তা আত্মপ্রকাশ করল;···পিসীমা সেবায় স্নেহে ধীরে ধীরে প্রশান্ত হয়ে এলেন। বাড়ির শ্রী ফিরল। নিজের রুচিমত তিনি ঘরগুলি সাজালেন।" মায়ের এই চিত্রই 'ধাত্রীদেবতার' জ্যোতির্ময়ীর মধ্যে ফুটে উঠেছে। এরপর আর জায়গায় তারাশঙ্কর লিখেছেন, "আমার মায়ের মধ্যে ছিল গভীর স্বদেশানুরাগ। আমার বাবারও ছিল। রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান যখন প্রথম অনুষ্ঠিত হয় তখন তাঁর ডায়রীতে পাই—৩০শে আশ্বিনের ডায়রী "বেঙ্গল পার্টিশন হইয়াছে, হিন্দু-মুসলমান সকল জাতিই মনে মনে দুঃখ পাইয়াছে।"

তিনি আরও জানিয়েছেন। "ঐ প্রথম রাখীবন্ধনের দিন আমার বড় মামা লাভপুরে ছিলেন। তিনি রাখী এনে আমার মায়ের হাতে বেঁধে দিতেই মা তাঁর হাত থেকে একটি রাখী

নিয়ে আমার হাতে বেঁধে দিয়ে মন্ত্র পড়েছিলেন—বাংলার মাটি—বাংলার জল—

এই ঘটনাটির উল্লেখ 'ধাত্রীদেবতায়' আছে। 'ধাত্রীদেবতার' মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের খানিকটা সাদৃশ্য আছে।...আমার মা সত্যই মহিমাময়ী।"

তারাশঙ্করের "বড় মামার মধ্যে মানিকতলার দলের ঢেউ এসে লেগেছিল।" পরবর্তী কালে তাঁর সেজ মামা উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। সুশীল ও পূর্ণর চরিত্রে তারাশঙ্করের মামাদের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। রামরতনের চরিত্র-সৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে গ্রামের নব-প্রতিষ্ঠিত ধনী হাই ইংলিশ স্কুলের থার্ড মাস্টার যাঁর সম্বন্ধে 'আমার কালের কথা'য় তিনি লিখেছেন, "স্কুলের থার্ড মাস্টার ছিলেন স্পষ্ট ভাষী এবং একটু বিচিত্র ধরনের মানুষ। তাঁর ওই স্পষ্টভাষিতার অপরাধে একদা তিনি অকস্মাৎ অপসারিত হলেন।" 'ধাত্রীদেবতা'র রামজী সাধু সম্পর্কে তাঁর উক্তি, "তখন তিনি আমাদেরই বাগানে তারা-মায়ের মন্দিরে থাকেন। প্রায় আমাদের সংসারেরই একজন। আমারই মায়ার ডোরে সন্ন্যাসী আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছেন।" অন্যত্র তিনি আরও লিখেছেন, "সন্ন্যাসী প্রথম জীবনে পল্টনে চাকরী করতেন, তখন তাঁর নাম ছিল বলভদ্র পাণ্ডে। সন্ন্যাসী জীবনে তাঁর নাম হয়েছিল রামজী সাধু। আমার ভাগ্যক্রমে রামজী বাবা—আমার গোঁসাই বাবাও—ছিলেন অদ্ভুত দক্ষ কথক।" তারপর ভৃত্য শম্ভুর পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "আমাদের বাড়ীর সঙ্গেও এমনি যোগ ছিল গুটি কতক পরিবারের। তাদের মধ্যে 'ধাত্রীদেবতা'র শিবুর অনুচর শম্ভু বাউরীদের বাড়ীই প্রধান। শম্ভুর পিতামহ থেকে তারা আমাদের বাড়িতেই কাজকর্ম করে।" তিনি গ্রামে যে রামলীলা করতেন সেই সময়কার যুদ্ধা-

ভিনয়ের পুনরাবৃত্তি করেন চৌদ্দ পনের বছর বয়সে। এই যুদ্ধের কতকটা ছাপ পড়েছে 'ধাত্রীদেবতা'র সূচনায়। এই সব থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে 'ধাত্রীদেবতা' তারাশঙ্করের আত্মজীবনের ছায়ায় এক বিশেষ মূল্য লাভ করেছে।

আত্মজীবনীর অংশ বিশেষ ছাড়াও রচনা রীতির প্রতিনিধিত্বে 'ধাত্রীদেবতা' উল্লেখনীয়। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য, সবলতা ও দুর্বলতা এই গ্রন্থে প্রায় সমভাবে পরিস্ফুট।

তারাশঙ্করের যে ত্রুটিগুলি তাঁর বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত যেমন কাহিনী বিন্যাসের শিথিলতা, অতিকথন, কাব্যিকতা, বক্তৃতাপ্রীতি, অকস্মাৎ নাটকীয়তা সৃষ্টি-প্রবণতা প্রভৃতি এই গ্রন্থেও প্রকটিত হয়েছে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে স্থানের বর্ণনা দিয়ে গ্রন্থারম্ভ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত সন্ন্যাসী প্রীতি, মৃত্যুচিন্তা, পাপপুণ্যবোধ প্রভৃতি। হাস্যরস সৃষ্টি, নাটকীয়তা-রচনা ও অতিকথনের দিক দিয়ে তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু প্রমুখের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সাহিত্য ধারাকে নিজস্ব ভঙ্গিমায় কাজে লাগিয়েছেন। সাধারণভাবে তারাশঙ্করের উপন্যাসে কাহিনীর গতিই চরিত্রকে এগিয়ে নিয়ে যায়। 'ধাত্রীদেবতা'তেও এই লক্ষণ পরিস্ফুট।

চরিত্রসৃষ্টিতে তারাশঙ্করের কৃতিত্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'ধাত্রীদেবতা'য় পিসীমা, মা, মাস্টার, রাম-রতনবাবু, গোঁসাইবাবা, ঝি, পাচিকা প্রভৃতির চরিত্র অভিজ্ঞতার স্পর্শে জীবন্ত। ফ্যালা ডোমের স্ত্রীর চরিত্রের অপ্রত্যাশিত মহনীয়তা খুব স্বাভাবিক নয়। খোনা মেয়েটির চরিত্র রূপায়নে তারাশঙ্করের স্বভাব নৈপুণ্যের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। নায়ক শিবনাথের চরিত্র সৃষ্টির ক্রমপরিণতির ধাপগুলি খুব স্পষ্ট ভাবে ফোটেনি। অনেক জায়গায়

একটা আকস্মিকতা রসানুভূতিকে আঘাত দেয়। এই কথা শিবনাথের স্ত্রী গৌরী বিষয়েও প্রযোজ্য। স্থান ও কালের বিস্তৃত পটভূমিকায় কোনো কোনো জায়গায় চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশের গতি মন্থর।

ভাষার দিক দিয়ে তারাশঙ্করের ভাষা উচ্ছ্বাসপ্রবণ হলেও গতিশীল। স্থানে স্থানে কবিত্বের স্পর্শ ভাষাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। বর্ণনার মধ্যে প্রচুর দেশজ বর্ণনায় তাঁর প্রবণতা লক্ষনীয়।

সাহিত্যসৃষ্টিতে তারাশঙ্করের সবচেয়ে বড় দাবী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার। তিনি অভিজ্ঞতার লোক। সেই অভিজ্ঞতার জোরে তিনি বিশেষভাবে একটি অঞ্চলের কথকতার ভেতর দিয়ে সমগ্র দেশ ও কালের হৃৎস্পন্দনটি ধরে প্রাচীন ও নবীনের এক বিশেষ মূল্যবোধ আমাদের কাছে হাজির করেছেন। এই কারণেই সমস্ত অসংলগ্নতা, ভাবালুতা ও আতিশয্য সত্ত্বেও তাঁর রচনায় মানুষ ও প্রকৃতির মর্ম এক আশ্চর্য অখণ্ডতায় ব্যক্ত হয়েছে। সৃষ্টি-শক্তিতে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়ের প্রাধান্যই বেশী। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এক গভীর কৌতূহল ও আসক্তি অনেক সময় বৈজ্ঞানিক মননকে ছাপিয়ে এক নিবিড় হৃদয়বোধের সাহায্যে সদাসৎ ন্যায়ান্যায় ও পাপপুণ্যকে এক শাক্ত তন্ত্রসম্মত সামগ্রিক চেতনায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে; এই সামগ্রিক চেতনার প্রকাশে 'ধাত্রীদেবতা' উজ্জ্বল। ব্যাপ্তি ও সমগ্রতা এই উপন্যাসকে একটা বিশেষ আবেদনে চিহ্নিত করেছে।

তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' যখন ছাপা বইয়ের আকারে প্রকাশিত হল তখন অনেকেই একে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন যে এতে ঔপন্যাসিক চিন্তাধারার এক নবদিগন্তের সূচনা হয়েছে। আবার কেউ কেউ একেবারে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছিলেন, অসীম শক্তিধর ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের হাতে এই উপন্যাস ঠিক যেন দানা বেঁধে ওঠে নি। মনে আছে, সেই সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায় ও সাহিত্যবাসরে—কালিন্দীর প্রকাশ এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তখনকার দিনের বামপন্থী সমালোচকেরা একে জানিয়েছিলেন অকুণ্ঠ স্বাগত সম্ভাষণ, আর দক্ষিণপন্থীরা এর মধ্যে দেখেছিলেন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের স্বধর্মচ্যুতির ইঙ্গিত।

তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' ॥ শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়

তারাশঙ্করের কালিন্দী প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে। সারা বিশ্বব্যাপী তখন মহাসমরের দাবাগ্নি জ্বলে উঠেছে—তার স্পর্শ এসে লেগেছে ভারতবর্ষের মাটিতে। যুগান্ত হোক বা না হোক—যুগান্তের ইঙ্গিত তখন ইঙ্গিত মাত্র না থেকে চারিদিকে তার বাস্তব প্রকাশ বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই সময়ে ভারতবর্ষের ইংরেজ রাজত্বের টলটলায়মান অবস্থা—জার্মানী ও জাপানের যৌথ আক্রমণে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের প্রায় নাভিশ্বাস উঠেছে। সেই নাভিশ্বাসের পথ ধরে নৈরাশ্য বা হতাশার রূপ পরিগ্রহ করেছে সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসৃত পোড়ামাটি বা Scorched earth নীতি। নিতান্ত অস্বাভাবিকতার

অবকাশেই সৃষ্টি হয়েছে হৃদয়-বিদারক মন্বন্তরের—লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল গৃহহারা মানুষ ছুটে এসেছে শহরে নগরে তাদের বাস্তু ফেলে তাদের ক্ষেতখামার ফেলে কেবল একমুঠো অন্নের আশায়। নির্মম হৃদয়হীন সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্ট এই মন্বন্তরের ফলে নগরে নগরে তখন ধ্বনিত হয়েছে বুভুক্ষুর মর্মন্তুদ আর্তনাদসিক্ত প্রার্থনা—'মা, ফেন দাও, ফেন দাও।' তখনকার কথা যাঁদের মনে আছে তাঁদের কাছে এ বিষয়ে বেশি বলার কোনো প্রয়োজন দেখি নে। কিন্তু তবু মনে রাখতে হবে কালিন্দী রচনার পটভূমিতে ছিল এক বিরাট নৈরাজ্যবাদ। চিরাচরিত জীবনযাত্রার একদিকে বৈপ্লবিক পরিসমাপ্তি ঘটছে—অপর দিকে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে নতুন কোনো বেঁচে থাকবার মতো পথ আবিষ্কার করাও ছিল আমাদের পক্ষে অতীব কষ্টকল্পনা। নৈরাজ্যবাদের একটা প্রধান অভিব্যক্তি হচ্ছে মানুষকে তার সংস্কারের রাতারাতি অবলুপ্তি ঘটিয়ে একটা নতুন রাস্তা খুঁজে বার করতে বাধ্য করা। নৈরাশ্য যত গভীর ও তামসনিমগ্ন রূপে প্রকাশ পায় ততই উদগ্র হয়ে ওঠে এই পথ খুঁজে বার করবার বাসনা। তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ এই নতুন পথে চলবার ঠিক একটা বাস্তব ধারাকে অনুসরণ করতে পারে না। তাই এই রকম রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক নৈরাজ্যের মধ্যে সাধারণ লেখকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে বার বার আর তার সাহিত্য-চেতনা নৈরাজ্যের অবসাদে হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত দিশাহারা। ঠিক এইরকম সময়ে মুষ্টিমেয় যে কয়জন ঔপন্যাসিক বা লেখক এই সর্বাত্মক নৈরাজ্যের মধ্যেও তাঁদের দূরদৃষ্টি না হারিয়ে সামাজিক রূপান্তরের মর্মকথাটিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে সাহিত্যের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতে প্রয়াসী হয়েছেন ও তার সঙ্গে যুগান্তকারী দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন—তারাশঙ্কর তাঁদের অন্যতম।

একজন বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচকের মতে, 'A great writer must not see what the world is, but must also see what the world is becoming.' অর্থাৎ সমাজের পতন অভ্যুত্থান বন্ধুর পথে যুগে যুগে যে অবশ্যম্ভাবী রূপান্তর ঘটে তার সঠিক পরিচয় জানার দায়িত্ব সব শক্তিমান লেখকেরই। কিন্তু নানা কারণে এ দায়িত্ব সকলে পালন করতে পারেন না। আমার বক্তব্য, তারাশঙ্কর এই দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করেছেন তাঁর নানা উপন্যাসে।

রাঢ়-অঞ্চলের গ্রামবাংলার সঙ্গে তারাশঙ্করের নিবিড় পরিচয় ছিল। শুধু তাই নয়, সেই অঞ্চলের অবক্ষয়-জর্জরিত সামন্ত প্রথা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। জমিদার শ্রেণীর প্রভুত্ব—তাদের কুচক্র-জাল-বিস্তারের অভিসন্ধি, দরিদ্র প্রজাদের উপর অকথ্য নির্যাতন ও নির্মম নিষ্পেষণ, সমাজের উঁচুতলার আভিজাত্যের নাম করে আলস্য ও আত্মকেন্দ্রিকতার দম্ভ—এ সবের সঙ্গেও তারাশঙ্করের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এই পরিচয় লাভের মধ্যেই তারাশঙ্করের সাহিত্যিক উপলব্ধির গভীরতা পরিপূর্ণরূপে চিহ্নিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। তার নিদর্শন যেমন আছে তাঁর 'গণদেবতা' ও 'ধাত্রীদেবতা'তে—তেমনই আছে 'কালিন্দী'তে। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, কালিন্দী সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকৃতি পাবার দাবি রাখে। এই উপন্যাসের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে আছে সর্বনাশা কালিন্দী—যে তীর ভাঙে-গড়ে, যার নতুন-ওঠা চরে-বুনো সাঁওতালেরা ঘর বাঁধে—জঙ্গল পরিষ্কার করে মাটিকে শস্যশ্যামলা করে তোলে নিজেদের বলিষ্ঠ বাহুবলের প্রয়োগে—সেই কালিন্দীর পাড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে-যাওয়া আত্মকলহে জীর্ণ হয়ে যাওয়া ওপর তলার মানুষেরা ষড়যন্ত্র করে লাঠালাঠি করে—কোর্ট কাছারি

করে—যেমন তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে করে এসেছে বহুদিন ধ'রে। এরই মধ্যে এই জগতের ক্ষুদ্র সীমানার ওপার থেকে নব্যবণিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে—কলওয়ালা কারখানাওয়ালারা এসে চর ইজারা নেয়—মুনাফা শিকারের অভিসন্ধি এঁটে চাষীকে করে তোলে ভূমিহীন শ্রমিক আর মানুষের দেহকে ব্যবহার করে বিপণির পণ্যের মতো। এর ফলে প্রায়-নিস্তরঙ্গ অর্ধমিত সমাজ-জীবনে নিয়ে আসে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার ভাবনা। নতুন মুনাফা-শিকারীর লোভ আরও নির্মম আরও সর্বগ্রাসী। নতুন কলওয়ালার বুদ্ধি আরও শাণিত, হৃদয় আরও বিবেকবর্জিত, তার কাছে মানুষ শুধু পণ্যের মুনাফা বাড়ানোর উপলক্ষ্য মাত্র। সামগ্রিকভাবে কলকারখানাগত শিল্পের বাড় বাড়ন্ত রূপ দিতে গিয়ে দুশো পাঁচশো লোক যদি ক্রীতদাসের মতো মনুষ্যত্ববর্জিত হয়ে পড়ে, তা হলে তাদের দিকে তাঁদের দৃষ্টিপাত করার সময় নেই। ফলে, ক্ষয়িষ্ণু জমিদারী প্রথার মধ্যে কোথায় যেন মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ-সূত্রটা বজায় ছিল—কিন্তু নবতন সমাজ ব্যবস্থায় তাও অবলুপ্ত হয়ে গিয়ে মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু কলের চাকা-ঘোরানো কারখানার উৎপাদন-বৃদ্ধির নিমিত্ত মাত্র। পূর্বে যেটা ছিল মনুষ্যত্বের অবমাননা—নয়া ব্যবস্থায় সেটি রূপান্তরিত হয়েছে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যুতে।

কালিন্দী উপন্যাসে বহু সাঙ্কেতিকতার নিদর্শন আমরা পাই। সর্বনাশা কালিন্দীর তীর ভাঙা-তীর গড়ার ইতিহাস-লাঞ্ছিত মানুষ-গুলির জীবনে যেন এক অমোঘ নিয়তি ক্রিয়াশীল। এক দিকে অহীন-মহীনের গল্প—অপর দিকে যৌবনে স্ত্রীহত্যাজনিত বিবেক দংশনে জর্জরিত রামেশ্বরের স্বকল্পিত কুষ্ঠব্যাধির অমূলক ভীতি ও তৎসংশ্লিষ্ট মনোবিকার—আবার এই জগতের মাঝে উমার বধূরূপে আবির্ভাব, রামেশ্বরের সুপ্ত কাব্যপ্রীতির নবজাগরণ আর এক

সাঙ্কেতিকতাকে মূর্ত করে তুলেছে। তার পর যুগ যুগ সঞ্চিত জমিদার গোষ্ঠীর পাপস্খলনের জন্যেই বোধ হয় অহীনকে নিয়তি টেনে নিয়ে যায় সন্ত্রাসবাদের দিকে। এও বোধ হয় এ আমার এ তোমার পাপ-জাতীয় সাঙ্কেতিকতা। উপন্যাস যেখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছে সেখানে দেখা যায়, সাঁওতালরা চর থেকে বাস তুলে দিয়ে প্রত্যুষের আলো-আঁধারির পথ ধরে অন্যত্র চলেছে আবার ঘর বাঁধবার জন্যে। আর তাদের রাঙাবাবু অহীন বোধ হয় রামেশ্বরের মতোই বহুযুগসঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছে ইংরেজ শাসকের বন্দীশালায়।

একজন প্রখ্যাত সমালোচকের মতে তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' উপন্যাস হিসেবে সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। তিনি নানাভাবে এই উপন্যাসের দোষত্রুটি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেই ক্ষান্ত হন নি বরং গল্পের গ্রন্থনা—চরিত্রের রূপায়ণ, উপন্যাসের মূল কাহিনীর বিবৃতি—সব কিছুকেই তিনি তীব্র সমালোচনার কশাঘাতে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। মনে হয় যে-সামাজিক রূপান্তরের পটভূমিকে আশ্রয় করে এই উপন্যাসটি রচিত সেদিকে তাঁর দৃষ্টি যথাযথভাবে প্রসারিত হয় নি। ফলে তাঁর উপরিকথিত মন্তব্য পরোক্ষে তারাশঙ্করের কৃতির প্রতি অবিচার প্রকাশকে অনেকটা প্রশ্রয় দান করেছে।

আজ তারাশঙ্করের স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে যে কথাটা বার বার মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে এই একালের প্রায় দু দশক পরে আজ এক যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বাঙালী পাঠককে এই 'কালিন্দী' উপন্যাস আবার ভালো করে পড়তে হবে—তার সঙ্গে উপলব্ধি করতে হবে যে কালিন্দী-র স্রষ্টা তারাশঙ্করের সাহিত্য দৃষ্টি ছিল দূর প্রসারী এবং সামাজিক ভাঙা-গড়ার মধ্যে যে নূতনত্বের ইঙ্গিত সর্বদা বিদ্যমান—

তা তারাশঙ্করের দৃষ্টি এড়ায় নি। কালিন্দী তাঁর এক সার্থক অনবদ্য সৃষ্টি। এই সার্থকতার মূলে যে আছে তারাশঙ্করের বৈপ্লবিক মনোভঙ্গী ও প্রসারিত জীবনবেদ আর what life is becoming তা বোঝবার ও বোঝাবার এক অপূর্ব মানসিকতা—তা নির্বিদ্বিধায় বলা যায়।

১

তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৯) নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্করের মধ্যে কবিপ্রাণ লুকিয়েছিল, এবং তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ত্রিপত্র' (১৯৩৩) এর প্রমাণ বহন করছে। কবিতা লিখলে এ যুগের বিচারে শব্দের নিরিখে তাঁর কাব্য ধোপে টিকতো না। কিন্তু কবিতা-রচনার এই ব্যর্থতায় তাঁর মনের ও হৃদয়ের ভেতরে একটা কবিদৃষ্টি সৃষ্টি হচ্ছিল, এবং এই 'ভিশনে'র সাহায্যেই তাঁর উপন্যাসের একটা নতুন অথচ অর্গানিক ফর্ম তৈরি হয়েছে। নতুন বলছি এই কারণে যে, প্রচলিত সাহিত্যের বা ঔপন্যাসিক ফর্মের মধ্যে তাঁব উপন্যাসকে ফেলে বিচার করলে তাঁকে আর্টিস্ট

তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন' ॥ বার্ণিক রায়

বলতে বাধবে। কিন্তু তিনি যে বিষয়বস্তু ও কাহিনী চরিত্র-ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, তাতে তারাশঙ্করেরই একটা নিজস্ব ফর্ম তৈরি হয়েছে। এবং এই ফর্মটা যেহেতু জীবনভিত্তিক, জীবনের স্পন্দন এবং রক্ত মাংস এর মধ্যে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সেই হেতু তাঁর উপন্যাসে এক প্রকার নতুন জীবনধর্মী ফর্ম দেখা যায়, যা বাংলা বা পৃথিবীর অন্য কোনো উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় না। জীবনের দাবিতেই ফর্মের মূল্য, তারাশঙ্করের লেখায় যদি জীবনবোধ ও বাস্তব জীবন তাঁর স্বধর্ম নিয়ে উপস্থিত থাকে, তাহলে তাঁর উপন্যাসে এক নতুন জীবনধর্মী রূপ আমাদের রসমুগ্ধ করে।

পাশ্চাত্যের পোশাক বা সভ্য জগতের পোশাক আদিম জাতিরা পরে না, কিন্তু তাই বলে তাদের মধ্যে জীবন নেই, একথা কেউ বলে না, এবং তাদের জীবনধর্মের রীতিতেই একটা রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারাশঙ্করের উপন্যাস সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা যেতে পারে এবং এই সত্য প্রমাণিত হয় 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে। তিনি যে প্রচলিত উপন্যাসের রীতি না মেনে জীবনের রীতিতে, চরিত্রের ধর্মে জাতীয় শক্তি ও প্রকৃতির প্রভাবে নতুন একটা রূপ তুলে ধরতে পেরেছেন, তার জন্যেই তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। সুতরাং রূপগঠনের বিচার বাইরে থেকে নয়, তার আন্তর-ধর্মের বহিঃপ্রকাশ হিসাবেই গণ্য।

তাঁর কবি দৃষ্টিই তাঁকে এই পথে চালিত করেছে। উপন্যাসের সামগ্রিক গঠন, বৃত্ত, চরিত্র, কাহিনী ঘটনা, দৈব প্রভাব, নিয়তি, অধ্যাত্মশক্তি এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এই কবিদৃষ্টির একটা পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তারাশঙ্করের উপন্যাসের বক্তব্যে ও ভাষায় রৌদ্র পৌরুষের সঙ্গে রুক্ষ ধূসরতার কঠিন কর্কশতা আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে। একটা তান্ত্রিক বীভৎসতার মধ্যে নিস্পৃহ সাধকের কঠোরতা 'চৈতালি ঘূর্ণি' (১৩৩৫) এবং অন্যান্য উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এই বীভৎস তান্ত্রিক ধর্মের নিস্পৃহতার অন্তরালে সত্তার গভীরে পরমানন্দ মাধবের জন্যে ভক্তির করুণ বেদনা প্রেমের আবেগে অতি সূক্ষ্মভাবে উচ্ছ্রিত হয়েছে। যে সৌন্দর্য-প্রেরণায় তিনি 'রসকলি' (১৩৪৫) ও 'কবি' (১৩৫১) লিখেছিলেন তা হয়তো আর তিনি লিখতে পারেন নি, কিন্তু এই প্রেমাবেগ ভক্তির ধারায় নির্ঝরিত হয়েছে, 'আরোগ্য নিকেতনে'! জীবন মশায়ের চরিত্রের পরমানন্দ মাধবের চরণে একান্ত আত্ম-সমর্পণের মধ্যে এই ভক্তিই আমাদের আধ্যাত্মিকতায় যেমন মুগ্ধ

করে, তেমনি কবিয়ালের প্রেম, মঞ্জরীর জন্যে জীবন মশায়ের প্রেম কি ভাবে ভক্তিতে পরিণত হয়েছে, সেই সত্যই প্রকটিত হয়। তাঁর সাহিত্যে প্রেম নেই, একথা সত্য নয়, তবে প্রেমের প্রকাশ ভিন্নতর। নাগরিক সভ্যতায় প্রেমের দ্বিধা দ্বন্দ্বের ও পাপের মধ্যে যে এক প্রকার গভীর মন্থিত মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণা ও জ্বালা ও পীড়ন আছে, তাঁর উপন্যাসে তা নেই। কিন্তু তাঁর উপন্যাসে প্রেমের একটা আভরণহীন নাটকীয় রৌদ্র পৌরুষ আছে, যা চৈত্রের কালবৈশাখীর মতো প্রচণ্ড, বিক্ষুব্ধ, আবার ধারাজলে স্নিগ্ধ, উচ্ছ্বসিত। এই আবেগের নিরূপণ করতে হবে প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে। কারণ প্রকৃতি একটা জীবনশক্তি, জীবনশক্তি বলেই মহামায়ার মতো তারাশঙ্করের চরিত্রকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে। কারণ প্রকৃতিশক্তি তারাশঙ্করের কাছে তান্ত্রিকের সাধনায় এসেছে। সাংখ্যের বা তন্ত্রের প্রকৃতি বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের মধ্যে প্রভাবিত করেছে কিনা মোহিতলালের মতো আমি নিশ্চিত বলতে পারি না; তবে তারাশঙ্করের রচনায় যে তন্ত্রের প্রকৃতি তাঁর বিভিন্ন রূপ নিয়ে উপস্থিত, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর আত্মজৈবনিক লেখায় এর কথা আছে, এবং বিভিন্ন চরিত্রে এই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। 'আরোগ্য নিকেতনে' দেশপ্রেমিক কিশোর বলেছেঃ 'নারী আর প্রকৃতি ও দুই সত্যই এক। দু দিন পরেই বুকে পা দিয়ে দলে আপনার পথে চলে যায়। কখনো নিজের নিজেই রক্তস্নান করে, তখন নিজে স্বামীকে গ্রাস করে ধূমাবতী সাজে, কখনো আবার নিজের বাপের মুখে স্বামী নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করে। কদাচিৎ পুরুষের প্রেমে পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে শান্ত অচঞ্চল হয়ে ধরা দেয়। যাদের ভাগ্যে এই পাওয়া ঘটে তাদের আর কিছু প্রয়োজন নাই। প্রতিষ্ঠা প্রশংসা সাম্রাজ্য এমন কি মুক্তিও না। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর নাই।

এ কেউ পায় না।' রঙলাল ডাক্তার এই উপন্যাসের একজন তান্ত্রিক সাধক। তারাশঙ্করের প্রায় উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তান্ত্রিক সাধকের সাক্ষাৎ মেলে, 'আরোগ্য নিকেতনে'ও তা আছে, এবং 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে মৃত্যুর সমস্ত পরিকল্পনার মূলে উপনিষদ ও পুরাণের সঙ্গে তান্ত্রিকধারণা গভীরভাবে অঙ্কিত। রূপবর্ণনার মধ্যে যেমন পুরাণের প্রভাব রয়েছে 'পিঙ্গলকেশা, পিঙ্গলনেত্রা, পিঙ্গলবর্ণা, গলদেশে ও মণিবন্ধে পদ্মবীজের ভূষণ, অঙ্গে গৈরিক কাষায়, সেই নারী মূর্তি', তেমনি মৃত্যুর পদধ্বনি অনুভবের মধ্যে তান্ত্রিক চেতনা কাজ করছে, কখনো অনুভব করেছেন সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে দেহের অভ্যন্তরে মৃত্যু শুয়ে আছে, কখনো নূপুর বাজিয়ে মৃত্যুর আগমন ধ্বনি শুনেছেন, 'যে পিঙ্গলকেশীকে ঘরে বসে চিন্তা করে, ধ্যান করে বিন্দুমাত্র আভাসেও পান নি, তাকে তাঁর চিকিৎসা সাধনার মধ্যে বিচিত্র ভাবে অনুভব করেছেন। নাড়ীর স্পন্দনের মধ্যে, লক্ষণের মধ্যে, রোগীর গায়ের গন্ধের মধ্যে, তার উপসর্গের মধ্যে, গাত্রবর্ণের মধ্যে, এমন কি আঙ্গুলের প্রান্তভাগের লক্ষণের মধ্যে সেই পিঙ্গলকেশীর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছেন।' তান্ত্রিক যেমন তাঁর দেহের ভেতরে কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়ে তার স্বরূপ উপলব্ধি করেন, জীবনমশায়ও এই মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছেন রোগীর দেহের ভেতরে এবং নিজ দেহের অভ্যন্তরে। এই পিঙ্গলকেশিনী মৃত্যুর অনুভব জীবন মশায় অনুভব করেছেন অদ্ভুতভাবে। 'অহরহই সে সঙ্গে রয়েছে, কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো, শ্রমের সঙ্গে বিশ্রামের মত, শব্দের সঙ্গে স্তব্ধতার মত, সংগীতের সঙ্গে সমাপ্তির মত, গতির সঙ্গে পতনের মত, চেতনার সঙ্গে নিদ্রার মত। মৃত্যুদূত তাঁর কাছে পেঁ ৗছে দেয়, অন্ধ বধির কন্যা অমৃত স্পর্শ বুলিয়ে দেন তাঁর সর্বাঙ্গে। অনন্ত অতলান্ত শাঁন্তিতে জীবন জুড়িয়ে যায়।'

অদৃশ্য অশরীরী মৃত্যুকে শারীর রূপে দেখা এবং অনুভবের মধ্যেই তারাশঙ্করের কবিদৃষ্টির পূর্ণ পরিচয় নিহিত। 'চৈতালি ঘূর্ণি' উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে এই কবিদৃষ্টি নেই, বরং সমাজ বিজ্ঞানীর মনোভাব শরৎচন্দ্রের ধারায় এসেছে। 'মহেশ' গল্পের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য আছে কিন্তু প্রাকৃতিক বীভৎস ও রুদ্র বর্ণনার মধ্যে একটা মহাকাব্যিক রূপ লক্ষ্য করা যায়। 'ধাত্রীদেবতা' (১৩৪৬) উপন্যাসে প্রকৃতি ও মাটির বর্ণনায় এই কবিদৃষ্টি প্রত্যক্ষীভূত। 'কবি' উপন্যাসে প্রকৃতি জগৎ মানুষ যেন প্রেমের আবেগেই নিতাই-এর অন্তরে নিত্য নতুন কবিতার সৃষ্টি করেছে। 'আগুন' (১৩৪৪) উপন্যাসে প্রেমের রূপটাকেই সঙ্কেতিত করেছেন এই নামকরণের সাহায্যে। তাঁর কবিদৃষ্টির অন্যরকম পরিচয় লক্ষ্য করা যায় প্রকৃতির মধ্যে মানুষী সত্তার আরোপে। কালিন্দীর চর ভয়ংকর নিয়তির অভিশাপরূপে চরিত্র ও ঘটনাকে প্রভাবিত করেছে, হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় কাহারদের সমাজ ও পরিবেশ একটা দুর্দমনীয় শক্তিরূপে উদ্‌ভাসিত। নাগিনীকন্যার কাহিনীতে নাগিনীর দৈবশক্তির ক্রুরতা ও অলৌকিকতা রমণীর দেহের রূপের সৌন্দর্যে বিকশিত। এবং হিজল বনের বর্ণনায় একদিকে রমণীয়তা, অন্যদিকে ক্রুরতা; একদিকে ভয়ংকর রূপ, অন্যদিকে আকর্ষণীয় মাধুর্য; নাগিনী কন্যার প্রতিবেশে ও অনুষঙ্গে একটা অদৃশ্য শক্তির সাঙ্কেতিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছে। এই সমস্ত বর্ণনা ও সংকেতের মধ্যে একটা বাস্তব ও নারীর রূপ বর্তমান, যাকে দেখা যায় তাকেই সংকেতের মাধুর্য ও তাৎপর্যে বাস্তবতার ঊর্ধ্বে উন্নীত করেছেন; কিন্তু 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে মৃত্যুর রূপের কোনো বাস্তব রূপ নেই, যাকে দেখে পাঠকের রূপচেতনা লেখকের নির্দেশিত পথে এগোতে পারে। এই অশরীরী অদৃশ্য রূপের পরিকল্পনা বর্ণনা এবং অনুভবের ভেতরই

তাঁর কবিপ্রাণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। রোগীকে কেন্দ্র করে মহাকাল পৃথিবীর সামগ্রিক কল্পনারূপ ধরে এসেছে। সন্দেহ নেই, পুরাণের ও তন্ত্রের কবিদৃষ্টি তাঁকে এই পথে সাহায্য করেছে, কিন্তু চিকিৎসকের ধারণার ভেতর তাকে অনুস্যূত করবার পেছনে তাঁর অনুভূতি ও জ্ঞান কাজ করেছে। সেদিক থেকে এই উপন্যাসে তাঁর কবিদৃষ্টি পূর্ণতর, ব্যাপক, জীবনমৃত্যুর মহাসীমায় পরিব্যাপ্ত। মৃত্যুর দ্বারা আচ্ছাদিত জীবনের বিচিত্ররূপ উদঘাটনে এবং সকলের মধ্যে মৃত্যুর আবির্ভাব অনুভবে, জীবন ও জগতের ওপারে অদৃশ্য নিয়তি-শক্তির ধ্রুব পরিণামের কাব্যিক রূপকল্পনায়, অধ্যাত্মবোধের প্রশস্ত উজ্জ্বলতায় এই উপন্যাসটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। 'আরোগ্য নিকেতন' পড়বার পর মনে হয়, আমরা এক মহাজীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছি, যে মহাজীবনের বিস্তৃতির মধ্যে বিচিত্র মানবতার কর্ম ও সংসার নিয়ে আমাদের মুগ্ধ করে এবং এই জীবনের উর্ধ্বে এক মহাশক্তি আমাদের নিয়ত ধ্রুব পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে অস্বীকার করা যায় না, অস্বীকার করলে মহাভয় আমাদের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে, স্বীকার করলে প্রশান্তির গভীরতা আমাদের অতলান্ত আনন্দ সাগরে ভাসায়। এই বোধেরই প্রকাশ পেয়েছে আতর বৌ-এর কথায়। আতর বৌ মুখরা, কথার বাণে ও ব্যবহারে জীবন মশায়ের জীবন অগ্নিদগ্ধ করেছে, মঞ্জরীর প্রতি আতর বৌ-এর ঈর্ষা তাঁকে জ্বালিয়েছে এবং সেই জ্বালা ছিটিয়ে দিয়েছে জীবন মশায়ের গায়ে, একমাত্র পুত্র বনবিহারীর মৃত্যুতে রিক্ত হাহাকার এবং স্বামীর প্রেম লাভের ব্যর্থতার যন্ত্রণা তাকে যেমন জ্বালিয়েছে, তেমনি সেই জ্বালার আগুন দিয়ে আতর বৌ দগ্ধ করেছে জীবন মশায়ের জীবনকে। কিন্তু তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক কৃতিত্ব এইখানে যে, এমনি একটি চরিত্রকেও পরিণামে সহানুভূতির

স্নিগ্ধতায় উদার ও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। তার প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা এক মুহূর্তে অপসৃত হয়, আমাদের হৃদয়ে আতর বৌ আসন গ্রহণ করে। জীবনমশায় মৃত্যুকে অনুভব করতে করতে চিরসমাধি লাভ করেছেন। এই মৃত্যু-গৃহীত জীবনমশায়ের শায়িত মুখটি তুলে আতর বৌ কাতর প্রশ্ন করেছেঃ 'ধ্যান সাঙ্গ হল? মাধবের চরণাশ্রয়ে শান্তি পেলে? আমি? আমাকে? আমাকে সঙ্গে নাও।' প্রশ্নের উচ্চকিত আর্তস্বর আত্মসমর্পণের গভীরতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে একটা মহাকাব্যিক পরিণতি এনে দিয়েছেন, এবং যার অনুভব শুধু সাবলাইম শব্দে প্রকাশ করা যায়। আরোগ্য নিকেতন আমাদের জীবনমৃত্যুকে ধরে নাড়া দেয়, আমাদের অস্তিত্বকে ভাবিয়ে তোলে, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আদি ও মৌল বোধ আমাদের অস্তিত্বের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে তোলে, আমরা মহাপ্রশ্নের সম্মুখীন হই এবং পরে প্রশান্ত গভীরতায় আত্মলীন হই। 'আরোগ্য নিকেতন' এ-জীবনের ও পরপারের আরোগ্য নিকেতন।

২

'আরোগ্য নিকেতন' দার্শনিক উপন্যাস হিসাবে গণ্য। দর্শন-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রূপ কল্পনা এবং অনুভূতি একসঙ্গে সক্রিয়। মৃত্যুই হচ্ছে এই দর্শনের মূল বিষয়বস্তু। এবং তাকে রূপায়িত করবার জন্যেই জীবনমশায়ের চরিত্রকল্পনা এবং তাকে বিস্তৃতি দেবার জন্যেই বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ। মৃত্যু সমাসন্ন জীবনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভয় আশঙ্কা, আতঙ্ক এবং প্রশান্ত গভীরতাকে চরিত্র ও ঘটনায় বৃত্ত রচনা করে একটা স্থায়ীরূপ দিয়েছেন। মৃত্যু যেন বিভিন্ন চরিত্রে এসে মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে, মৃত্যুর বিভিন্ন রূপ গন্ধ বর্ণ স্বাদ স্পর্শকে ইন্দ্রিয়সংবেদনায় মূর্তিময় করে তুলেছেন। মৃত্যুকে এই উপন্যাসে আমার নায়িকা বলে মনে হয় না, মৃত্যু একটা মহাদৈবশক্তি

বা নিয়তি, তাকে জানা যায় না, চেনা যায় না, চকিত দর্শনে একটা মোহাবেশ সৃষ্টি করে আমাদের আরো প্রলুব্ধ করে, তাকে অস্বীকার করলে মহা ভয়, স্বীকার করলে মহা শান্তি। স্বীকার বা অস্বীকার যাই করি, অনিবার্য নিয়তির মতো আমাদের অস্তিত্বকে মৃত্যু আচ্ছাদিত করে, এই মহাশক্তির অভ্যন্তরে বিলীন হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই, নায়িকার মতো তার মনে প্রেমের লীলাখেলা চলে না, সে সুন্দরী রমণী ঠিকই, কিন্তু সে নিয়তি, তার আবির্ভাব শুধু চৈতন্যে অনুভব করা যায়, তাকে নিয়ে হৃদয়ের খেলা চলে না। জীবনমশায়ের মধ্যে এই প্রশ্ন বারংবার উচ্চারিত হয়েছে : 'মৃত্যু কি? মৃত্যু কেমন? কি রূপ? কেমন স্পর্শ? কেমন স্বাদ?...এই বিচিত্ররূপিণী বহুরূপার আসল পরিচয়টি কি?' এর আসল পরিচয় জীবনমশায় কখনো জানতে পারেন নি, তাঁর চিকিৎসা-সাধনার মধ্যে তাকে শুধু অনুভব করেছেন, তার আবির্ভাবের পদধ্বনি শুনেছেন। চিকিৎসা-সাধনা এক প্রকার তান্ত্রিক সাধনাই, এও শবের ওপর বসেই চৈতন্যকে জাগ্রত করবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, এক প্রকার যোগ সাধনা, তাই এই মৃত্যুর আবির্ভাবকে নীরবে যোগসাধনার সাহায্যে স্বীকার করাই হলো মহাকাল ও মহাজীবনের সঙ্গে একীভূত হওয়া। যে না পারে, তার কাছে জীবন ও মৃত্যু দুটোই ভয়ংকর ও দুর্বিষ হয়ে ওঠে।

কিন্তু মৃত্যু নিয়তি এবং দুর্বার শক্তি হলেও, তাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও জীবনের কোষে কোষে আনন্দকে অস্বীকার করা যায় না। এই উপন্যাসে যদি কোনো সার্থক নায়ক-নায়িকা থাকে তাহলে তা জীবন ও মৃত্যুর, পুরুষরূপী জীবন তার বিচিত্র কর্মের সমারোহে ধরিত্রীর আনন্দকে উদ্ঘাটিত করতে চাইছে, আর মৃত্যুরূপী রমণী এই জীবনকে আচ্ছাদিত করতে চাইছে। এই জীবন-মৃত্যুর লীলাই এই

উপন্যাসের মুখ্য বিষয়বস্তু। আলোরূপে জীবন উদ্ভাসিত, আর অন্ধ বধির মৃত্যু অবগুণ্ঠনের ফাঁকে জীবনকে আলিঙ্গন করতে চায়, কিন্তু আলো যখন মহা নিয়তিরূপী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তখন আলোর আভা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, মৃত্যুর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুজনের এই প্রেমের লীলাই জীবধাত্রী ধরিত্রীকে বৈচিত্র্যে পূর্ণ করে তুলেছে। মৃত্যুর রূপ যেমন তারাশঙ্কর বর্ণনা করেছেন, তেমনি জীবনের রূপকেও তুলে ধরেছেন অনবদ্যভাবে: 'জীবনের চারিদিকে ছটা রসের ছড়াছড়ি; আকাশে বাতাসে ধরিত্রীর অঙ্গে ছয় ঋতুর খেলা, পৃথিবীর মাটির কণায় কণায় যেমন উত্তাপ এবং জলের তৃষ্ণা, জীবের জীবনেও তেমনি দেহের কোষে কোষে রঙ ও রসের কামনা। না-হলেও সে বাঁচে না। মানুষের মনে মনে আনন্দের ক্ষুধা। শোক থাকবে কেন, শোক কোথায়?' এই নাটকীয় দ্বন্দ্বই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তারাশঙ্করের জীবনশিল্পী হিসাবে কৃতিত্ব এই তিনি আমাদের অস্তিত্বের আদি এবং আদিম শক্তি ধরে নাড়া দিয়েছেন, সমস্যার সম্মুখীন করেছেন। কি প্রেমে, ভালোবাসায়, ঘৃণায়, প্রবৃত্তিতে, রিপুর তাড়নায়, লোভে স্বার্থে কামে সমস্ত দিক থেকেই তিনি মৌল শক্তি ও চেতনার গভীরে জীবনোপলব্ধির মাধ্যমে প্রবেশ করেছেন এবং এই মৌল শক্তির প্রভাবেই বাঙালির জাতিগত মৌলিক সংস্কারের অতলান্ত প্রদেশের হৃদপদ্মের নিরাভরণ রূপ বর্ণ গন্ধকে আমাদের কাছে ইন্দ্রিয়গোচর করেছেন, এই অর্থেই আঞ্চলিকতা, মোহিতলালের ভাষায়, একটা জাতিগত সংস্কারে পরিণত হয়েছে।

৩

তারাশঙ্করের অপর কৃতিত্ব এই উপন্যাসে তিনি আধ্যাত্মিকতার ধ্রুব বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন। এই অধ্যাত্মবুদ্ধি এবং উপলব্ধিই

তাঁর উপন্যাসের বাস্তবতাকে জীবন থেকে অনেক ঊর্ধ্বে উন্নীত করেছে। অন্যান্য উপন্যাসে যা ছিল, এখানে তার পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ রূপ লক্ষ্য করি। এই অধ্যাত্মবুদ্ধির সাহায্যেই এবং উপলব্ধিতেই তিনি বাংলার সংস্কৃতির ঐতিহ্যধারাকে বহন করে নিয়ে এসেছেন। বিভূতিভূষণও এই অধ্যাত্মবোধে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর রোমান্টিক কবিকল্পনার রহস্য রঙিন আনন্দের মতো বেদনা বোধ জাগায়, আর তারাশঙ্কর আমাদের আদি শক্তির কাছে নিয়ে যান, সমগ্র অস্তিত্বকে উন্মথিত করে তোলেন। ভাষা ও রচনারীতির দিক থেকেও দুজনের পার্থক্য রয়েছে। তারাশঙ্করের ভাষা রৌদ্র পৌরুষে দৃপ্ত ও দীপ্ত; কঠিন কঠোর কর্কশ ও রুক্ষ, দৈগান্তিক ব্যাপ্তি এ ভাষায় শোভা পায়, এর ধ্বনি গাম্ভীর্য শ্রাবণ রাত্রির বিদ্যুৎ বিস্ফারিত দুর্যোগের মতো, প্রতিটি শব্দ পরিচিত ঝঙ্কৃত। নির্ধারিত, প্রস্তরের মতো স্তব্ধ, থেমে থেমে মানে বুঝতে হয়। একসঙ্গে গড়গড়িয়ে পড়া যায় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটা ছন্দ ধ্বনি, ছন্দ স্পন্দ গোপনে মনের মধ্যে কাজ করে। 'আরোগ্য নিকেতনে'র ভাষার মধ্যে একটা ক্লাসিক আদর্শ কাজ করছে, চরিত্র ঘটনা ও প্রকৃতি বর্ণনায় এবং চরিত্রের মুখে উপভাষার মধ্যে একটা আঞ্চলিকতা, বাস্তবতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ গড়ে উঠেছে, এবং দুয়ে মিলে একটা পরিবেশ তৈরি করছে। 'আরোগ্য নিকেতনে'র বর্ণনার ভাষার সঙ্গে রাজশেখর বসুর মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদের ভাষার সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ভাষা প্রয়োগ লক্ষণীয়;

(ক) 'সগৌরবে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে পুষ্প বিকাশের মতোই অকুণ্ঠ প্রকাশে হাসি মুখে বিকশিত হয়ে উঠেছে।'

(খ) 'বলতে গেলে আজকের আমি জন্মাই সূর্যোদয়ে, মরি নিদ্রার সঙ্গে দিনান্তে রাত্রির অন্ধকারে, আবার জন্মাই নূতন প্রভাতে জন্মান্তরে।'

(গ) 'পিঙ্গলবর্ণা পিঙ্গলকেশিনী, পিঙ্গল চক্ষু কন্যা, কৌষেয়-বাসিনী, সর্বাঙ্গ পদ্মবীজের ভূষণ, অন্ধ বধির।'

(ঘ) 'ভারী জুতোর শব্দে স্তব্ধ পল্লীপথের দু পাশের বাড়ির দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে বৃদ্ধ হস্তীর মত জীবন ডাক্তার চললেন—গ্রাম পার হয়ে, স্বল্প বিস্তৃতির একখানা মাঠ পার হয়ে—নবগ্রামের পূর্বপ্রান্তে, ঘন জঙ্গলে ঘেরা দেবাশ্রমের দিকে। বর্ষার রাত্রি—অবশ্য অনাবৃষ্টির বর্ষা; তবুও রাস্তা পিছল, একটু সাবধানেই পথ চলতে হচ্ছিল।'

(ঙ) —'আঃ। মরতেও আমারে দিবা না? মরণেও আমার একতিয়ার নাই? হারে নসীব? হারে নসীব? হেসে আবার বলে—পারবা না মিয়া, পারবা না, রব্বানি শ্যাকের কাছে যাতি দিতে আমারে না—পার। কিন্তু ইবার যে বধুঁর সাথে আসনাই করে তার হাত ধরছি--তার হাত ছাড়াইতে তুমি পারবা না—পারবা না—পারবা না। আঃ আমায় একবার ছেড়ে দাও; খানিক ঘুমায়ে লই।'

প্রথমটির মধ্যে 'এ'কার ধ্বনির স্তব্ধতায় গম্ভীরতা আমাদের থামিয়ে দিচ্ছে, এই থামানো ব্যাপারটা অর্থের জন্যে, প্রথম তিনটি শব্দে 'র' এর অনুপ্রাস যুক্ত অক্ষরে ঝঙ্কার তুলছে, পরে 'প' 'ক' 'শ'-এর অর্ধঅনুপ্রাস কাজ করছে। তৃতীয় উদাহরণে গম্ভীর ও একই শব্দের বারংবার ব্যবহারে অশরীরী রূপ বর্ণধ্বনি চিত্তে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। চতুর্থ উদাহরণে উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে চরিত্র গঠিত হয়েছে। পঞ্চম উদাহরণের ভাষার মধ্যেই তারাশঙ্করের কৃতিত্ব, এ বীরভূমের উপভাষা, এবং মুসলমান সমাজের ভাষা, বিষ জর্জরিত মুমূর্ষু তরুণী ব্যর্থ প্রেমের হতাশা থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষায় বৃদ্ধ স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলছে, এই ভাষার মধ্যেই চরিত্র সজীবন্ত হয়ে উঠেছে, অন্য কোনো বর্ণনা বা বিশ্লেষণ-এর প্রয়োজন হয় না। তারাশঙ্করের

উপন্যাসে এই উপভাষার প্রয়োগ প্রথম থেকেই সার্থক ভাবে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু বর্ণনা বা বিশ্লেষণের ভাষা দীর্ঘদিনের ব্যবহারে পরিবর্তিত হয়েছে, ঘন কঠিন দৃপ্ত ও ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্কর বিভিন্ন ধরনের উপন্যাসে বিভিন্ন প্রকার ভাষা ব্যবহার করেছেন, 'আরোগ্য নিকেতন'-এও বিভিন্ন চরিত্র অনুযায়ী ভাষা এসেছে, কিন্তু তাঁর ভাষার বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বর্ণনার ও বিশ্লেষণের মধ্যে। এই রৌদ্র পৌরুষের ভাষার সঙ্গে 'কবি' উপন্যাসের ও 'রসকলি'র ভাষার কোমলতা একটা বৈপরীত্য জাগায়। 'আরোগ্য নিকেতনে' মরি বোষ্টুমীর ভাষায় সেই গুণ লক্ষ্য করা যায় 'মায়ের গাছের আম প্রথম পেকেছে, মা কালীর জন্যে সব্বাগ্যে ক'টি তুলে রেখে পাঁচটি আপনার তরে দিয়ে বললে, দিয়ে এস মরি। তা আজ আবার আমাদের গুপীনাথপুরে আখড়াতে অষ্ট প্রহরের ধুলোট ছিল। বৈষ্ণব সেবার রান্নাবান্নার কাজ করে হাত ধন্যি করতে গিয়েছিলাম। ফল জিনিস তো 'দিবসের' মধ্যে হবে না, মজে মিষ্টি হবে, খাবার উপযুক্ত হবে।' তবে ভাষার এইগুণ এসেছে সহজাত প্রবৃত্তির বশে, সচেতন শিল্পীর প্রেরণায় নয়, যদি আসতো তাহলে বাক্যের শেষে একঘেয়ে 'ছে'-এর ব্যবহার পুনরাবৃত্ত হতো না: 'রাত বেশ হয়েছে। নবগ্রামের লেনদেনের বাজারের আলোগুলোও ঝিমিয়ে পড়েছে। লণ্ঠনের কাচে কালী পড়েছে, পলতেতে মামড়ি জমেছে। শিখাগুলো কোনোটায় দুভাগ হয়ে জ্বলছে, কোনোটার একটা কোণ ধোঁয়াটে শিখা তুলে লম্বা হয়ে উঠেছে।' তারাশঙ্কর তো এখানে অস্বস্তিকর একঘেয়ে জীবনের বর্ণনা দিতে চান নি, চেয়েছেন বাজারের বিচিত্রতা আনতে, তাই একই ধরনের ক্রিয়াপদের ব্যবহার কানে লাগে।

এক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের ভাষার ললিত মাধুর্য, রোমান্টিক বেদনার রঙিন অজানা আনন্দ, দূরপথিকের দূরান্তের পথের ব্যথার গোপন

কান্না সূক্ষ্ম চঞ্চল স্রোতের মতো প্রবহমান। দুজনের ভাষাই আমাদের মুগ্ধ করে। কারণ দুজনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে ভাষা সার্থকতর হয়েছে, বিভূতিভূষণের ভাষার স্রোতে আমার ভেসে যাই, 'মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয় নি, তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে ঠাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়, কি ধলচিতের খেয়া ঘাটের সীমানায়। তোমাদের সোনাডাঙার মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ার পাড়ি দিয়ে পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে··· দেশ ছেড়ে দেশান্তরের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডি এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে।' তারাশঙ্করের ভাষার সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য মেলে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষার : 'হারুর মাথার কাঁচা পাকা চুল আর মুখের বসন্তের দাগভরা রুক্ষ চামড়া ঝলসিয়া পুড়িয়া গেল। সে কিন্তু কিছুই টের পাইল না। শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মূক অবচেতনার সঙ্গে একান্ন বছরের আত্মমমতায় গড়িয়া তোলা চিন্ময় জগৎটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।'

তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের ভাষার পার্থক্যের মতো গঠন কৌশলেও পার্থক্য রয়েছে। বহুদিন পূর্বে 'পথের পাঁচালি' আলোচনা করতে গিয়ে মোহিতলাল বলেছিলেন যে, এ উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টি বা ঘটনা-বিবৃতি এর লক্ষ্য নয়, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ নেই, সমস্যা বা তর্ক নেই, গল্পবস্তুর চমৎকারিত্ব নেই। জ্ঞান বুদ্ধি তর্ক সমস্যার চেয়ে হৃদয়ের উপলব্ধিই হলো প্রধান কথা, শাশ্বত-কালের চিরন্তন বেদনা রূপের বিচিত্রতায় বিভূতিভূষণ ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কারণেই 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসে কোনো কাহিনীবৃত্ত রচিত হয়নি, চলমান স্রোতের মতো শুধু বর্ণনার পর বর্ণনা আছে, কি মানুষের, কি জীবনের, কি প্রকৃতির, এগুলির স্বাতন্ত্র্য নেই, অপুর মনকে শুধু ছুঁয়ে গেছে, তার

চৈতন্যকে প্রসারিত করেছে, সম্মুখের দিকে নিয়ে গেছে। কিন্তু তারাশঙ্করের উপন্যাসে কাহিনী ঘটনার একটা বৃত্ত আছে, বহু ও বিচিত্র চরিত্র এসেছে, তারা এসে মিলিয়ে যায়নি,এরা যেমন নায়ককে ছুঁয়ে গেছে ভাবনায় ও ঘটনার সংঘর্ষে, তেমনি তাদের চরিত্রগত গুণের জন্যেও অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে এগিয়েছে এবং পরিণতিতে একটা বৃত্ত রচনা করেছে। এই বৃত্তই প্লট সৃষ্টি করে। এবং এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবির্ভাবে নাটকীয় চমৎকারিত্ব। ঘটনা ও চরিত্রকে তিনি একসঙ্গে মিলিয়েছেন, কাহিনী রচনা করেছেন, গল্প বলেছেন, সেই সঙ্গে চরিত্রের পরিণতি দেখিয়েছেন কালের পরিবর্তনে।

'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে তারাশঙ্কর কাহিনী, গল্প ও ঘটনাকে সোজাসুজি কালের স্রোতে বলেন নি, যেমন 'ধাত্রীদেবতা'য় বলেছেন। 'ধাত্রীদেবতা' কিশোর থেকে যুবক হয়ে ওঠার কাহিনী, তাই অতীতের কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু এখানে অতীত স্মৃতি রোমন্থনের সাহায্যে পুরনো কাহিনী ও ঘটনাকে কখনো বর্ণনা করেছেন, কখনো চিত্রিত করেছেন। কিন্তু অতীত স্মৃতি রোমন্থনই এই উপন্যাসের মুখ্য বিষয়বস্তু নয়, বর্তমানের সঙ্গে অতীত এসে যুক্ত হয়েছে, অতীত কাহিনী ও চিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই বর্তমানের ঘটনা এসেছে। নায়ক জীবনমশায় ভাবুক, তাই ভাবনার পথেই অতীত তাঁকে আবিষ্ট করেছে, কিন্তু বর্তমানে জীবনের সঙ্গে জড়িত বলে এখনকার ঘটনা ও সংঘাতকে এড়াতে পারছেন না। যদিও অতীতটাই মুখ্য,কারণ সত্তর বছর অতীতে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, বর্তমানে মাত্র দেড়টি বছর। তাই কাহিনী ও বর্ণনা একবার এগিয়েছে, একবার পেছিয়েছে, চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়েছে, অতীতের কথা ভেবেছে, অতীত আবার বর্তমানের সঙ্গে বৃত্ত রচনা করেছে। এ যেন নদীর তরঙ্গের

ওঠা পড়া। কিন্তু তিনি যে বৃত্ত রচনায় কতখানি আগ্রহী তার প্রমাণ মেলে উপন্যাসের শেষে জীবনমশায়ের হারানো প্রেমিকাকে রোগী হিসাবে প্রদ্যোত ডাক্তারের বাড়িতে টেনে আনায়। এতে মঞ্জরীর ভাব-কল্পনা আমাদের কাছে অনেকটা হারিয়েছে, তাকে আমরা এই তুচ্ছ দীন রূপে দেখতে চাই না, কারণ মৃত্যুদূতীর এই রূপ আমাদের কল্পনাকে গৌরবান্বিত করে না। হয়তো জীবনমশায়ের মনের একপ্রকার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ হয়েছে, তাতে চরিত্রের গৌরব বাড়ে নি। এবং প্রদ্যোতকেও জীবনমশায়ের জীবনের সঙ্গে এমনিভাবে জড়িত করে কাহিনীর জগতের মধ্যে একটা সংগতি আনতে চেয়েছেন। এবং উপন্যাস পড়তে বসেই মনে হয়, এ উপন্যাসের পরিণতি হবে নায়কের মৃত্যুতে। এই সচেতন বৃত্ত রচনার প্রয়াস তাঁর উপন্যাসে বারংবার দেখা যায়। এই উপন্যাসে বাইশ অধ্যায় পর্যন্ত মাত্র দুদিনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, বর্তমানের সঙ্গে অতীত স্মৃতির রোমন্থনে এবং বাকি পনেরো অধ্যায়ে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ঘটনা মিলিয়ে এক বছর দু তিন মাসের ঘটনা লেখক বর্ণনা করেছেন। শ্রাবণে কাহিনীর সুরু, পরের আশ্বিনে কাহিনীর পরিসমাপ্তি। জীবনমশায়ের চরিত্রের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন। জীবন-মশায়ের একটা সুবিধা ছিল। তিনি বৈদ্য হিসাবে সমাজের সমস্ত স্তরের লোকের পরিচয় জানতেন, তাই এত চরিত্রের ও ঘটনার বৈচিত্র্য আমাদের পীড়িত করে না এবং জীবনমশায় জীবনে ব্যর্থ হতাশায় ভুগছেন বলেই তাঁর ভাবুক চিত্তে বেদনার সংবেদনা ও অতীত স্মৃতি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। জীবনমশায় নিজেই বলেছেন: 'অতীতকালের কথায় একটা নেশা আছে। বড় মনোরম বর্ণ বিশ্বাস। চোখ পড়লে আর ফেরানো যায় না। বিশেষ করে

যেখানটার কথা মনে পড়ছে এখন সেখানটা যেন ওই আকাশের রক্তসন্ধ্যার বর্ণচ্ছটার মতই গাঢ়।'

৪

একদিকে জীবনমৃত্যু, অন্যদিকে নূতন পুরাতন—এই দুইদিকের সমস্যা ও প্রশ্ন জীবনমশায়ের চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। জীবনমশায় জীবনকে স্বীকার করেন, জীবনের পাপপুণ্য ভালোমন্দ ন্যায় অন্যায় সবই তাঁর কাছে এসেছে উদার স্নিগ্ধ সহিষ্ণুতায়। জীবনমশায় কাউকে ঘৃণা করেন না, ধিক্কার দেন না, শ্লেষ করেন না, চিকিৎসা সাধনার সঙ্গে সমবেদনা ও সহানুভূতি মিলে তাঁর চরিত্র স্নিগ্ধ সরসীর মতো হয়ে উঠেছে। একদিকে যেমন জ্ঞান, অন্যদিকে সহানুভূতি এই চরিত্রকে মহান ও পবিত্র করেছে। তিনি বাস্তবতার দিক থেকে প্রাচীনপন্থী হলেও নূতনকে, নূতনের তপস্যাকে অস্বীকার করেন নি, তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, প্রণাম জানিয়েছেন এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাবিধি মানিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু জীবনমশায় সেদিন মনে মনে মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের সাধনাকেও প্রণাম জানিয়েছিলেন। মৃত্যুকে জয় করা যাবে না কিন্তু মানুষ অকালমৃত্যুকে জয় করে। নিশ্চয় করবে! ধন্য আবিষ্কার। ইউরোপের মহা পণ্ডিতদেরও প্রণাম করেছিলেন। হ্যাঁ—আজ দেবজ্ঞ তোমরাই। একথাই বলেছিলেন।' এই স্বীকৃতির মধ্যে বেদনা নেই, পরিতৃপ্তি আছে। তাই জীবনমশায় জলসাঘরের রাবণেশ্বর রায় থেকে অনেক পৃথক, পুরাতনের বেদনা ও নূতনের আবির্ভাবে পরাজয়ের গ্লানির চেয়ে পুরাতনের মধ্যে নবীনের উদার আবির্ভাব ও মহান প্রসারিত হয়েছে। নতুন দাম্ভিক দুর্বিনীত, নিরাসক্ত মমতাহীন, নিস্পৃহ, ইহলোকের জীবন সাধনায় প্রকৃতিকে বশ করবার জন্যে যুদ্ধে সর্বদা প্রস্তুত, ইহলোকের পর্ব পারে মৃত্যু

সম্বন্ধে, মৃত্যুর আবির্ভাব সম্বন্ধে, তার অনুভব সম্বন্ধে নবীন চিকিৎসা পদ্ধতির কোনো চেতনাই নেই। জীবনমশায়ের নিদান হাঁকা সম্বন্ধে প্রদ্যোত ডাক্তার বলেছেঃ মৃত্যু ঘোষণা করে আনন্দ পাচ্ছে। আশ্চর্য! মৃত্যু পৃথিবীতে নিশ্চিতই বটে, সে কে না জানে? তাকে জয় করবার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। সে সাধনা অব্যাহত চলে আসছে। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার হয়ে চলেছে। আজও তাকে রোধ করা যায়নি। আজও সে ধ্রুব—তবু তো মর্মান্তিক—বিয়োগান্ত ব্যাপার। তার মধ্যে যেন একটা আধ্যাত্মিক কিছু আরোপ করে এই মৃত্যুদিন ঘোষণা--চমকপ্রদ বটে, রোমন্টিকও বটে—কিন্তু নিষ্ঠুর। ঠিক পশুকে বলি দেওয়ার মত।' তাই প্রদ্যোত ডাক্তার জীবনমশায়কে দেখতে পারে না, তার বিরুদ্ধে নালিশ করতে চায়, তাকে অপমান করে, কিন্তু এই প্রদ্যোত ডাক্তারও শেষের দিকে জীবনমশায়ের স্নেহ মমতায় সিক্ত হয়েছে, স্বীকার করেছে, এই রকম মমতা ও ভালবাসা বেশি বয়স না হলে আসে না। এবং তার স্ত্রীর নাড়ী দেখতে বলেছে, তার নাড়ী জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই প্রদ্যোত ডাক্তার তার স্ত্রী মঞ্জুর চিকিৎসা করেছে। এমনি করে নতুন পুরাতনের একটা মিলন সেতু রচনা করতে চেয়েছেন।

জীবনমশায়কে যদি প্রাচীন জীবনের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করি এবং প্রদ্যোত ডাক্তারকে নবীন জীবনের প্রতিনিধি ধরি, তাহলে একটা দ্বন্দ্ব সংঘাত অর্থাৎ সমষ্টিগত সংঘাত এই উপন্যাসে উপজীব্য হয়ে উঠেছে মনে করতে পারি। এবং চিকিৎসার সম্পর্কেই এঁরা বিভিন্ন মানুষের সম্পর্কে এসেছেন, জীবনমশায়ের মনে প্রতিটি রোগীর অবস্থা চরিত্র চিন্তা ভাবনা যেমন ভাবে আলোড়িত করে, নিস্পৃহ প্রদ্যোত ডাক্তারের মনের মধ্যে তা করে না, তার কাছে শুধু

রোগ এবং রোগের প্রতিকার, রোগীর মৃত্যুতে কখনো বিষণ্ণতা এলেও ক্ষণিক, সমস্ত সত্তাকে নাড়ায় না; যেমন জীবনমশায়ের ক্ষেত্রে বিপিন, বনবিহারী, শশাঙ্কের মৃত্যু আলোড়িত করেছে। জীবন-মশায় ভূমিনির্ভর গ্রামীন সভ্যতার মানুষ, যেখানে জমিদারই প্রধান, জমিকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবন গড়ে ওঠে, তার চরিত্র গড়ে ওঠে; যেখানে জাতিবর্ণ ভাগ বিদ্যমান, যেখানে হিংসাদ্বেষ কুটিলতা, বীভৎসতা রয়েছে, কিন্তু সকলের সঙ্গে সম্পর্কও আবার ছিন্ন হয়নি, নাগরিক সভ্যতার স্বার্থপরতা দেখা যায়নি, তারাশঙ্কর বলতে চান এই ভূমিনির্ভর গ্রামীন সভ্যতার মধ্যেই নতুনের সদগুণকে মিলিয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়। এই কারণে প্রদ্যোত ঠিক যথার্থ প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠেনি।

জীবনমশায় এই উপন্যাসের নায়ক, তাঁর পিতা জগৎ দত্ত, বা পিতামহ নায়ক নয়, কারণ তাঁরা বাস্তব জীবন থেকে এতো উর্ধ্বে, তাঁদের জীবন ও চরিত্রের ভাব কল্পনা এতো আকাশচারী, মর্ত্যের ধূলি তাঁদের অঙ্গে লাগে না। কিন্তু জীবন মশায়ের চরিত্রে ও জীবনে বাস্তবজীবনের ধুলো বালি, মাটি, আদিম রিপুর প্রবৃত্তি, সুপ্ত প্রেমের প্যাশন, রূপোন্মাদনা, সৌন্দর্যবোধ এমন ভাবে তাঁর বংশগত উন্নত ধারণার সঙ্গে মিশে গেছে, যে তার বাস্তব মূর্তি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিশোর বয়সে জীবনমশায় মস্ত পালোয়ান, পেটে ঢুঁ মেরে বড়ো বড়ো জোয়ানদের ফেলে দিতেন, কাঁদীতে পড়বার সময় মঞ্জুরীর রূপ মোহে উন্মাদ, এবং উন্মাদ অবস্থায় ভূপী বোসের নাক ফাটিয়ে দিয়ে দশ ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে নবগ্রামে ফিরেছেন, মঞ্জুরীকে কেন্দ্র করে তাঁর বিলাস প্রাচুর্য, অমিত ব্যয় স্ফূর্তি, গান বাজনা, খাওয়া দাওয়া সবই ঘটেছে বাস্তবের পথে এবং বিবাহের পর স্ত্রীর মধ্যে মঞ্জুরীর প্রেম প্রশমিত হয়নি, প্রশমিত হয়নি তার

বহুবিধ কারণ। তাঁর স্ত্রী আতর বৌ-এর জীবন বঞ্চনায় পরিপূর্ণ। এই বঞ্চিত জীবনের পূর্ণতা চেয়েছিল স্বামীর প্রেমে কিন্তু স্বামীর হৃদয়ের হাহাকার দেখে আতর বৌ মুখ ঘুরিয়েছে। ফলে' স্বামী ও স্ত্রীর জীবন প্রেমের দ্বারা পূর্ণ হয়নি, আতর বৌ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছে, আর জীবনমশায় চিত্ত প্রেম কারো মধ্যে পূর্ণতায় দেখতে না পেয়ে নিজের মনে নিঃসঙ্গতার পাহাড় সৃষ্টি করেছেন, সেই পাহাড়ের মধ্যে অতীত স্মৃতির মায়াবরণ দিয়ে আকাশচারী হয়েছেন এবং কন্যাদের বিবাহ ও একমাত্র পুত্র সন্তান উচ্ছৃঙ্খল বনবিহারীর মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গতার পথ ধরেই নিজের দেহের অভ্যন্তরে মৃত্যুর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় দিন গুণছেন। তাঁর পিতা এবং পিতামহের জীবনে মৃত্যুর অনুভব চিকিৎসা সাধনার একটা অঙ্গ, কিন্তু জীবন-মশায়ের ক্ষেত্রে মৃত্যুর আবির্ভাব শুধু রোগীর ক্ষেত্রে নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কাতর আহ্বানের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে, তাই মৃত্যু তার কাছে এতো মোহন, সুন্দর, শান্ত, স্থির। কারণ মৃত্যুর মধ্যেই তিনি এ জীবনের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা, বঞ্চনা হাহাকার ভুলে যেতে চান, মৃত্যু ছাড়া এ জ্বালা আর কেউ ভোলাতে পারে না। তাই ব্যক্তি হৃদয়ের বেদনায় এ মৃত্যু বড়ো স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে, এই কারণেই তিনি নায়ক। জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছেন, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যৌবনের চাঞ্চল্য ও অধৈর্য স্থির হয়ে গেছে, জীবনকে উদার সহিষ্ণুতায় ও ভালোবাসায় দেখেছেন, সেই সঙ্গে মশায় বংশের সমস্ত সদগুণ এসে মিলিত হয়েছে। কিন্তু মঞ্জরীর জন্যে তাঁর হৃদয়ের রিক্ত হাহাকার মরেনি, ঘুমিয়েছিল। তাই মঞ্জরীকে দীর্ঘদিন পরে প্রদ্যোতের বাড়ি দেখার শেষে তাঁর হৃদয়ের আর্ত চিৎকার যেন রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে সকলকে চমকে দিয়েছে। ওই চিৎকার এবং আতর বৌ-এর বারণ না শুনে সাবিত্রীব্রতে অতসীয়ার দেওয়া খাবার খেয়েই

তিনি মৃত্যুকে কাছে টেনে এনেছেন। সুতরাং মঞ্জরী তাঁর কাছে মৃত্যুর দূতী হয়েই এসেছে এবং এই মৃত্যুদূতীর সঙ্গে আতর বৌ ব্যাধির যন্ত্রণার মতো সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুতে শান্তি পেয়েছেন। সুতরাং জীবনমশায়ের চরিত্রে মহত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবতা তাঁকে পরিপূর্ণ মানুষ করে তুলেছে। তিনি স্ফূর্তিবাজ যুবক, গান বাজনায় অনুরাগী, পালোয়ান, তীক্ষ্ণ ও মেধাবী কিন্তু মেলায় গিয়ে সকলের সঙ্গে জুয়া খেলতেও তাঁর বাধে না। জুয়া খেলার সঙ্গে তাঁর চরিত্রের একটা দিক জড়িয়ে আছে, জুয়াটা শুধু জুয়াই নয়, রোগী সারবে কিনা জুয়ার ভাগ্যের ওপর তা নির্ধারণ করতে চেয়েছেন, এখানেই চরিত্রের মূল শক্তির সঙ্গে ঘটনা জড়িত। নিদান হাঁকাটাও তাঁর জীবনের ব্যর্থতার একপ্রকার সূচনা।

জীবনমশায় ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের পূর্ণতার দিকে তেমন নজর দেননি, জোর দিয়েছেন কাহিনী ও বৃত্তের দিকে। কিন্তু বিচিত্র জীবনের সমারোহ আমাদের মুগ্ধ করে। যে সমস্ত রোগী জীবন-মশায় দেখেছেন, তারা কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। এরা কেউ সৎ, কেউ অসৎ, কেউ খেতে খেতে মরে, কেউ কামে মৃত্যুবরণ করে, কেউ উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মরে, কেউ বমনের রোগে মরণ আহ্বান করে, কারো ক্ষেত্রে মৃত্যু আগন্তুকরূপে আসে, এদের মধ্যে কেউ মৃত্যুকে স্বীকার করতে চায় না, জীবনে বেঁচে থাকতে চায়, কেউ আত্মহত্যা করে মরে নীতিহীন প্রেমের ব্যর্থতায়। ডাক্তার চরিত্রও বিভিন্ন, রংলাল ডাক্তার নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত হলেও একটা তান্ত্রিক সাধনা তার মধ্যে রয়েছে। হরেন ডাক্তার হলেও মশায়ের প্রতি একপ্রকার শ্রদ্ধা সম্ভ্রম হারায়নি, চারুবাবু গ্রাম্য ডাক্তার, প্রদ্যোত এদের প্রতিনিধি। প্রদ্যোত যেমন তার পেশায় পৃথক, তেমনি জীবন-মশায়ের রিক্ত প্রেমের বিপরীত কোটিতে তার অবস্থান। মঞ্জু

ও প্রদ্যোত ডাক্তারের প্রেমের পূর্ণতা জীবনমশায়ের কাছে মানস সরোবরের কল্পনা এনেছে। কিন্তু এসবই জীবনমশায় দেখেছেন, যেমনি তারাশঙ্কর দেখেছেন দেশকে সমাজকর্মী ও দেশসেবক হিসাবে, কিন্তু সকলের সঙ্গে মায়ায় মমতায় স্নেহে ভালোবাসায় একাত্ম হয়ে গিয়েছেন, তাই যে মুহূর্তে মৃত্যুর জন্যে উদগ্রীব হয়েছেন, সেই মুহূর্তে জীবনের আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছেন। মুহূর্ত পূর্বে বৈরাগ্য গৈরিক উদাসীন পৃথিবী যেন একমুহূর্তে গাঢ় মমতায় সবুজে কোমল হয়ে উঠল। জীবনমশায় ভদ্র, সহিষ্ণু, কর্মী, পরোপকারী, উদার এবং ধ্যানী কিন্তু অন্তরে বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত, নিঃসঙ্গ, একাকী, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় উদাসীন উন্মুখ। সেই সঙ্গেই মিলেছে বাস্তবের জীবনপ্রীতি, মৃত্যু আক্রান্ত রোগীদের সম্বন্ধে তাই বলেছেন: 'বিপিন আরোগ্য লাভ করুক। মতির মা সুস্থ হয়ে ফিরে আসুক। দাঁতু বেঁচে উঠুক। তাঁর সব উপলব্ধি সব দর্শন ভ্রান্ত, মিথ্যা হয়ে যাক।' জীবনমশায় প্রদ্যোত মঞ্জু আতর বৌ ছাড়া প্রায় সব চরিত্রই টাইপ। এবং তারাশঙ্করের সাহিত্যে দোষই বলি বৈশিষ্ট্যই বলি, এসব চরিত্রই বিভিন্নভাবে তাঁর অন্য উপন্যাসে আছে এবং পুনরাবৃত্ত হয়েছে। বিভিন্ন উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের ওপর নূতন ও ভিন্ন আলোকে তাদের শুধু উদ্‌ভাসিত করেছেন, বিস্তৃত করেছেন। আতর বৌ ধাত্রীদেবতার গৌরীরই পরিণত রূপান্তর। তবে অনুভূতি ও জীবন জিজ্ঞাসার জন্যে নতুন হয়ে উঠেছে। বাস্তবের আকার থাকলেও 'আরোগ্য নিকেতন' চিরন্তন কালের অসীম জিজ্ঞাসার অপূর্ব ধ্যানের মূর্তি; স্থানে কালে তাকে বাঁধা যায় না।

তারাশঙ্কর কবিও ছিলেন। বহু প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্পকারের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয়েছে যেমন কাব্যের মাধ্যমে, তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সাহিত্যিক প্রচেষ্টার গোড়ার দিকে তিনি যেমন বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলেন, তেমনি সে চর্চা অব্যাহত গতিতে অন্যান্য রচনার সঙ্গে সমান তালে না চললেও, তাতে ভাঁটা পড়েনি এবং মাঝে মাঝেই তার প্রকাশ ঘটেছে এখানে ওখানে পত্র-পত্রিকায়, পুস্তক-পুস্তিকায়।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থই কাব্যগ্রন্থ ; নাম 'ত্রিপত্র'। ৬০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ইংরেজী ১৯২৬ সালে। এই গ্রন্থের

কবি তারাশঙ্কর ॥ বিশু মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশ ব্যাপারে 'আমার সাহিত্য জীবন' নামক গ্রন্থে কিয়ৎপরিমাণ রসিকতা করে, তিনি তাঁর এক শ্যালক কিভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই গ্রন্থের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক ভাবে সেই কাহিনীর কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করলাম।

...তিনি লিখেছিলেন, "এই ছেলেটি [শ্যালক] আমার থেকে বয়সে বছর কয়েকের ছোট ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ সহোদর হিসাবে এবং স্বকীয় স্বাভাবিক গুণে আমার পেট্রন হয়ে উঠলেন। এবং জোর করে আমার কবিতার খাতা নিয়ে—কবিতার বই ছেপে বসলেন। লাল কালিতে ছাপা কবিতার বই। ছাপা হ'ল কোন প্রেসে মনে

সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর ও বনফুল।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রে সাহিত্যিকদের অভিনয়। পেছনে—তারাশঙ্কর, প্রমথ নাথ বিশী, অমলহোম, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বসে—স্বপনবুড়ো, নীলিমা সান্যাল, লায়লা খান, বাণী রায়, মৌমাছি। সামনে বসে—সজনীকান্ত দাস।

দিল্লীতে একাডেমী পুরস্কার নিচ্ছেন—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর হাত থেকে।

তারাশঙ্করের আঁকা একটি গ্রাম বাংলার ছবি।

তারাশঙ্করের আঁকা আর একটি ছবি।

তারাশঙ্করের কুটুম কাটুমের একটি।
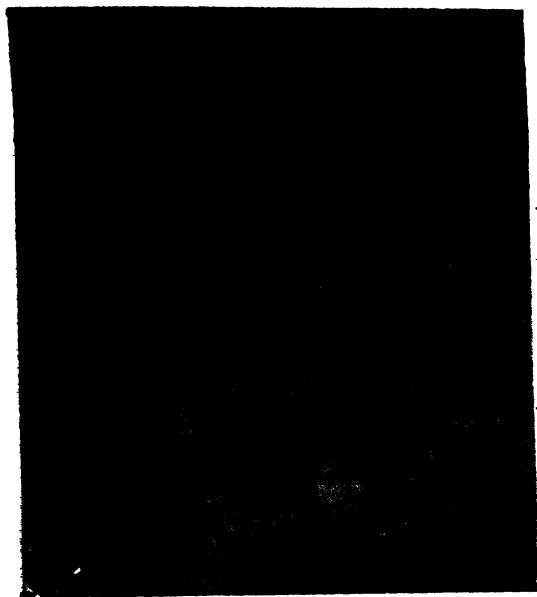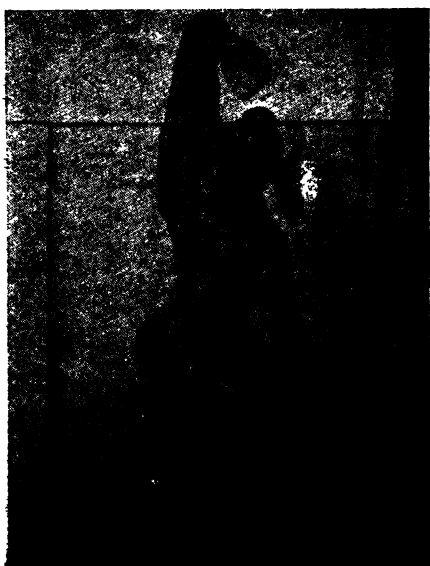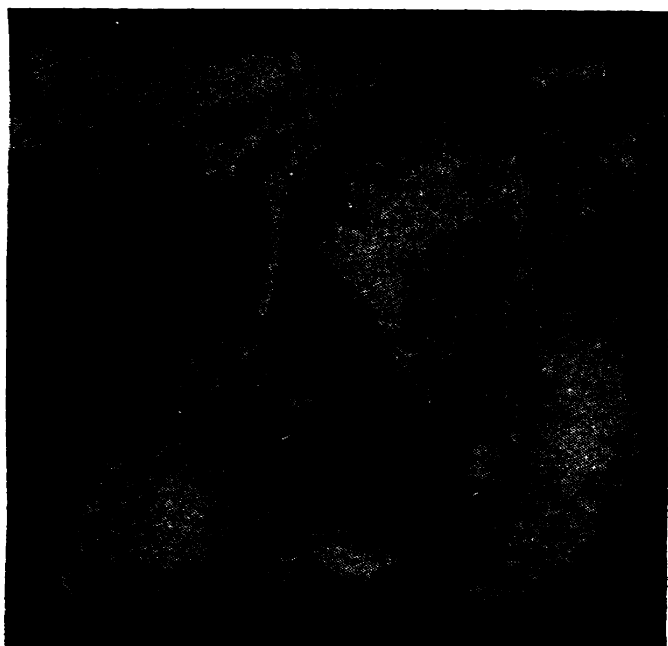
তারাশঙ্করের কুটুম কাটুম।

নেই, তবে কয়লার ব্যবসায়ী মহলের লেটার হেড ছাপা হোতো সেখানে। এবং বইগুলি এসে উঠল শ্যালকের অপিসে। কোণে বস্তাবন্দী হয়ে পড়ে রইল। অতঃপর শ্যালক কলকাতার ব্যবসায়ের পাঠ উঠিয়ে গেল রাণীগঞ্জ অঞ্চলে; বইগুলি আবার স্থানান্তরিত হোলো সালিখার এক লোহার কারখানায়। এদিকে শ্যালকটি একদিন মোটর সাইকেলে চড়ে রাণীগঞ্জ অঞ্চলের পাথুরে ডাঙার উপর পাথরে ধাক্কা খেয়ে পড়ে বুকে আঘাত পেলেন, তা থেকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল নিউমোনিয়া এবং তাতেই তাঁর ঝঞ্ঝার মত জীবনের অবসান হোলো। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে 'ত্রিপত্রে'র সর্বসন্ধান বিলুপ্ত হোলো।"

এই হ'ল তাঁর প্রথম কবিতা পুস্তক প্রকাশের মর্মান্তিক কাহিনী। অতঃপর যদিও তারাশঙ্করের আর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, তথাপি এই মর্মান্তিক ঘটনা তাঁকে কবিতা, গান, ছড়া প্রভৃতি রচনা থেকে কোনদিনই বিরত করতে পারেনি। তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে রসের যে প্রস্রবণ ছিল, তার বহুল নিদর্শন ভাবব্যঞ্জক কবিতা, গীতি-কবিতা, সংগীত, ছড়া প্রভৃতি উপন্যাসের মাধ্যমেও প্রকটিত হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর 'কবি', 'রসকলি', 'মঞ্জুরী অপেরা' গ্রন্থগুলি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই প্রচুর পরিমাণে এর স্বাদ পেয়েছেন।

'কবি' উপন্যাসে বিশেষ করে তারাশঙ্করের ছড়া, গান ও কবিতার ছড়াছড়ি দেখা যায়। কিছু অংশ গ্রামীন কবিয়ালদের, কিছু পদাবলী সাহিত্যের পঙ্‌ক্তি এবং লোক সংগীত থেকে উদ্‌ধৃত হলেও, বেশ কিছু যে তাঁর নিজের সৃষ্টি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। 'মঞ্জুরী অপেরা'র মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কেবলমাত্র এই গ্রন্থগুলির মধ্যেই নয়, 'ইমারত' গ্রন্থের 'ইমারত' 'তৃষ্ণা' 'তামাসা' গল্পগুলির মধ্যে। 'স্থলপদ্ম' গ্রন্থে 'স্থলপদ্ম' গল্পের মধ্যে; 'যাদুকরী'

গ্রন্থের 'বাউল', 'যাদুকরী' প্রভৃতি গল্পে তাঁর গান, ছড়া উপভোগ্য রসিকতা ও রসকথার নিদর্শন বহুল পরিমানে দেখা যায়।

ভাষার মাধুর্য, ভাবের পারম্পর্য ও কোথাও ছন্দের সুসম্বদ্ধ গ্রন্থনায়, আবার কোথাও বা ছন্দ-বন্ধনের মুক্তির ব্যঞ্জনায় তাঁর কবিতা-গুলি রসবেত্তাদের কাছে সর্বত্রই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রধানতঃ তারাশঙ্করের জীবনদর্শন ও শিল্পবোধের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণববাদের যে সমন্বয় ঘটেছে, তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর অধিকাংশ সংগীত ও কবিতাগুলির মধ্যে, এতদ্ব্যতীত ক্ষেত্রবিশেষে নিসর্গনিষ্ঠা সমাজ-চিত্র এবং ইতিহাসও মূর্ত হয়েছে তাঁর কাব্যে।

'নিবেদন' নামক একটি অনবদ্য কবিতায় তিনি লিখেছেন—

পৃথীবীর গুহাগাত্রে কোন উষাকালে
পাথরের তীক্ষ্ণ কোণে কাটিয়া আঁচড়
ছবি এঁকে রেখে গেছে। কালের কপালে—
এ জীবন-বিহঙ্গের—ধারালো নখর
কাটা লিখা। একাল পর্যন্ত সেই থেকে
চলে সেই দাগ টানা ; পৃথিবীর বুক
কালের আঁচড়ে কেটে বীজ দেয় ঢেকে
কৃষকেরা চিরকাল, অন্ন তৃপ্ত সুখ
স্বাস্থ্যের আনন্দ আনে নতুন ফসল
মিষ্টঘ্রাণে বাতাসের সর্বাঙ্গ সুবাস
সবুজ সোনালী রঙে ধরণী উজ্জ্বল।
মানস আনন্দ-ক্ষেত্রে চলে সেই চাষ ;
আজ যারা কলমে আঁচড় টেনে যায়
তারাই ফসল বোনে—তাহাদের পায়

নতি রেখে যাই আমি আমার সন্ধ্যায়—
তোমরা আঁচড় টানো, এ ধরণী আছে প্রতীক্ষায়।

কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭১ সালের 'জনসেবক' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়। আদিম মানুষ গুহাগাত্রে কঠিন পাথরের বুক ফুঁড়ে সেই আদি যুগে তার শিল্পকার্যের যে স্বাক্ষর রেখে গেছে, তার সঙ্গে কৃষিকার্যে কৃষকদের অবদানের বিষয়ও অনুরূপ ভাবে তুলনা করে দেখিয়েছেন কবি। মাটির বুকে এই আঁচড় টানা থেকে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য ও আনন্দ সৃষ্টির কথা যেমন উল্লিখিত হয়েছে তেমনি মানস আনন্দের ক্ষেত্রেও যাঁরা কলমের আঁচড় টেনে ফসল ফলিয়ে চলেছেন, কবি তাঁদেরও তারিফ করে নতি জানিয়েছেন। এছাড়া এই 'ত্রিবেদন' কবিতার মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের লেখক-গোষ্ঠীকে তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এই ধরণী তোমাদের কাছ থেকেও অনেক কিছু আশা করে; তাই আমি আমার জীবন-সন্ধ্যায় সেই মানস-ফসল বোনার চাষী অনাগত লেখকদের পায় আমার প্রণতি জানিয়ে যাচ্ছি।

অমিল ছন্দের ভারী সুন্দর উচ্চাঙ্গ ভাবদ্যোতক এই কবিতাটি। ইতিহাসাশ্রিত সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা চিত্তাকর্ষকভাবে রক্ষিত তো হয়েছেই, তাছাড়া যুক্তিবাদ ও হার্দ্যগুণের সকল প্রকার পরিচয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। কবি এই কবিতাটির শেষাংশে তাঁর উত্তর-সাধকদের যে নতি জানিয়েছেন, তার মধ্যে তাঁর উদার মহান্ মনোভাবই প্রকট হয়েছে।

'আগমনী' নামক আর একটি কবিতার মধ্যে আমরা পাই প্রবীণ কবির অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতা, অন্তর্দৃষ্টি ও নিসর্গনিষ্ঠার পরিচয়। অধিকন্তু এই কবিতাটির মধ্যে কবিবরের দৈববিষয়ক চিন্তন-মননেরও একটি সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে।

এই কবিতাটিতে তারাশঙ্কর লিখেছেন—

গড়িয়া মাটির মূর্তি অন্তরের আকুল আহ্বানে
আদি জননীরে ডাকি।
কে আদি জননী কেহ আছে কিনা তাই কেবা জানে?
তবু ডেকে থাকি।
মনে করি মা এসেছে, মনে মনে ঘর ভরে ওঠে
বাহিরে সোনার রোদে পুকুরে শালুক পদ্ম ফোটে।
ধানে ধানে ভরা মাঠ
জলেতে পিছল ঘাট
নালা ও নদীর ধারে হাল্কা সাদা বনফুল দোলে।
তরুণী মেয়েরা সব হাসিমুখে ছেলে কোলে
আজিকে বাপের বাড়ী চলে।
আকাশ কি ঝলমল
চলেছে মেঘের দল
কি শুভ্র উজ্জ্বল মেঘ—দলে দলে চলেছে উত্তরে।
ঘরের আঙিনাখানি আলো করে থরে থরে
শিউলির ফুল ঝরে পড়ে।
এ শরতে বাংলা দেশে অন্তরের আকুল আহ্বানে
পৃথিবীর আদি মাতা, তুমি এস আমাদেরই প্রণীত বিধানে।

'আগমনী' কবিতার বিষয়বস্তু হ'ল এই। শরতে শারদীয় প্রাকৃতিক শোভার ভাবসম্পদ বিশিষ্ট, ছন্দ মাধুর্য ও বর্ণনাভূয়িষ্ঠ জগন্মাতা শারদার আহ্বান-লিপি ধরে দিয়েছেন কবি প্রধানতঃ এই কবিতাটির মধ্যে।

এই ধরণের রসগর্ভে ভাবশ্রীমণ্ডিত আরও কবিতা লিখেছেন তারাশঙ্কর। এখানে তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। সেগুলির

অধিকাংশের মধ্যে কোথাও নিত্যকালের সত্য অনুসন্ধানে তাঁর আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে, কোথাও তাঁর দার্শনিক নিরাসক্ত মন ক্রিয়া করেছে, আবার কোথাও মাটির পৃথিবীর মমতায় তিনি ব্যাকুল হয়েছেন। মূলতঃ একটি শিল্পীমনে সূক্ষ্ম শিল্পকার্যের যে বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে, কবি তারাশঙ্করের মনের ভাবান্তরের মধ্যে সেই সকল ভাবতরঙ্গই রূপপরিগ্রহ করেছে কাব্যের মাধ্যমে। এখানে তাঁর কাব্যবিশেষের কিছু অংশ উপযুক্ত বক্তব্যের প্রমাণ স্বপক্ষে প্রকাশিত হ'ল। তিনি বলেছেন—

'নিত্যকালের সত্যটারে গেলাম খুঁজে খুঁজে
পেলেও তারে যায় না ধরা এইটা গেলাম বুঝে।'

এই দুটি পংক্তির মধ্যে সত্যানুসন্ধানে তাঁর ব্যর্থতা ও সারূপ্য নির্ণয়ের স্পষ্ট চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি আর একটি সত্যের সন্ধান পেয়ে, সেটির সত্যতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

'নিত্য আকাশে সূর্য উঠিয়া নিত্য অস্ত যায়
মনের আকাশে সূর্য উঠিলে তাহার অস্ত নাই।'

সত্য-নিরীক্ষার এ এক অপূর্ব নিদর্শন। এছাড়া তাঁর উপলব্ধ সত্য সম্বন্ধে তিনি তাঁর কাব্যের মধ্যে আরও বলেছেন—

'জীবনের কেন্দ্রে জাগে যে শক্তি তোমার
সে দেবে পাথেয়, তারে কর আবিষ্কার।'

মাটির পৃথিবীর রুক্ষতার মাঝেও যে সরসতা আছে, মমতা, সহৃদয়তা আছে, সে কথা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

'এ ধরণী ক্ষমাহীন—পৃথিবী তো মাটি ও পাথর
তারই মাঝে কি বিচিত্র—মানুষের মমতার ঘর
বার বার ভাঙে ঘর, মানুষেরা গড়ে বার বার
ভাঙা ঘরে কাজলের দাগে থাকে পরিচয় তার।'

এই কবিতার অংশ বিশেষ পঙ্‌ক্তিগুলি তারাশঙ্করের কবিতার খাতা থেকে সংগৃহীত এবং এর কিছু অংশ মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত।

বিভিন্ন ধরণের উচ্চাঙ্গের সরস কবিতা ব্যতীত ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক ও কবি তারাশঙ্কর শ্রেষ্ঠ সংগীত-রচনাকার হিসাবেও খ্যাত হতে পারেন। কবিতার মতই প্রচুর গান লিখেছেন তিনি। তাঁর গানগুলির অধিকাংশ বৈষ্ণব-রসপ্রধান হলেও, তার মধ্যে বাস্তব নিরপেক্ষ এবং সাম্প্রতিক কালের ভাব সমন্বিত ও রসাস্বাদ বিশিষ্ট সংগীতও আছে প্রচুর। এই সংগীতের সকলগুলি সুরের মূর্ছনায় সাধারণ্যে প্রচারিত হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু হলে, এগুলি যে মানুষের মনমুকুরে উচ্ছ্বাস আনন্দাবেগ সৃষ্টি করবে তাতে আর ভুল নেই। আসলে শব্দ ব্যবহারের শৈল্পিক নিষ্ঠায় ও ভাবের পারম্পর্য রক্ষায় প্রতিটি সংগীতই হয়েছে অনবদ্য ও সার্থক।

তাঁর একটি বিশিষ্ট সংগীতের মধ্যে আমরা পাই—

তোমার শেষ বিচারের আশায় বসে আছি।
তোমার রাজ কাছারীর দেউড়ীতে হে—বসে আছি।
চোখের জলই পাওনা কি হায় শুধু
 এই জীবনের বিকিকিনির পেশায়।
কি যে আমার পাওনা-দেনা—
তুমি ছাড়া কেউ জানে না—
অপর জনে—তা মানে না—ডিক্রি নিয়ে শাসায়।
 খেয়া ঘাটের পারে পারে
 মাশুল দিয়ে বারে বারে
শেষ খেয়ার ধারে এবার এলেম দেউলে দশায়
পাওনা যদি না থাকে তো বল অকূলে কূল, ভাসাই
 অথৈ পাথার সর্বনাশায়।

এর মধ্যেও নিয়তির ইশারা ও প্রচ্ছন্ন বেদনা-ক্ষোভ সম্ভবত তাঁর অজ্ঞাত দেবতার উদ্দেশেই যেন ব্যক্ত হয়েছে। দৈবত-বিষয়ক সংগীতের প্রাচুর্য যেমন তাঁর রচনার মধ্যে বহুল পরিমাণে দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় কবিয়ালের গান, দয়িত-দয়িতার উদ্দেশে রচিত রস-সংগীত ও পদাবলী সংগীতের অনুরূপ প্রচুর গান। সেদিক থেকে তারাশঙ্করকে বর্তমান যুগের অন্যতম পদকর্তা হিসাবেও গণ্য করা যায়। তাঁর 'রাইকমল' গ্রন্থের গান যা শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মুখে গীত হয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছে, তা হ'ল—

'মধুর মধুর বংশী বাজে
কোথা কোন কদমতলীতে
আমি পথের মাঝে পথ হারালাম
ব্রজে চলিতে'...

এ ছাড়া আরও গান, যথা—

'ও আমার মনের মানুষ গো
তোমারি লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর।
ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা—
আমায় হোথা টানে নিরন্তর।
সে ছটাতে ঘর জ্বলিল
পথ করিলাম সার
চারকোণে চার বৃন্দাবনে
বংশী বাজে কার।
মন ভুলিল, পথ হারালাম ছটার সুরে গো
সুখের একি আকুল আতান্তর।'

এমনি আধিদৈবিক, আধিভৌতিক নানা ভাব ও রসাত্মক গানের নিদর্শন তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে, খাতার মধ্যে অপ্রকাশিত ভাবে

পর্যাপ্ত পাওয়া যায়। অনেকের অনেক অটোগ্রাফের খাতার পাতায় তিনি কবিতার সঙ্গে স্বাক্ষর লিখে দিয়েছেন এবং সেগুলির প্রকাশ যে স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীলভাবেই হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এই ধরণের কয়েকটি স্বাক্ষর আমার দেখার যে সুযোগ ঘটেছিল, তা থেকেই দেখেছি যে, সেই সকল অটোগ্রাফ খাতায় দুটি বা চারটি পঙ্‌ক্তি যাই তিনি লিখে দিয়েছেন, তা শুধু শব্দ মিলিয়েই ছেড়ে দেননি, তাদের শব্দের মাধুর্যে ও ভাবের ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

এমনি একটি ছেলের খাতায় লেখা কয়েকটি পঙ্‌ক্তির কথা মনে পড়ে। সেখানে তিনি লিখেছিলেন—

'জীবনে দুঃখের দিন আপনার অধিকারে আসে
অশ্রুজল দিয়ে তারে ব্যথিত সে নীরবে সম্ভাষে।
আছে কি তাহার মাঝে অমৃতের স্বাদ ?
বিধাতা কি তার মাঝে করে আশীর্বাদ ?
জানি না উত্তর !'

আর একটি মেয়ের খাতায় তিনি লিখেছিলেন—

'নয়নের মণিদীপে সুন্দরের আরতির শিখা,
আকাশ ললাটে আঁকে জ্যোতির্ময় সূর্য-ললাটিকা।'

কি সুন্দর, সমিল, পরিচ্ছন্ন দুটি পঙ্‌ক্তি এবং কী গভীর অর্থদ্যোতক !

আসলে তারাশঙ্কর লঘুভাবে কোন কিছুকেই দেখেননি—দেখেন নি তাঁর জীবনকে এবং সাহিত্য-কাব্য সৃষ্টিকে। সে জন্যই তাঁর সৃষ্ট কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে এসেছে মানবতার প্রভূত প্রভাব। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর চেতনায় প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বৈতভাব পরম উপলব্ধির মধ্যে অনুভূত হয়েছে। আসলে কাব্যের মধ্যে তিনি

তাঁর মনের সূক্ষ্ম আবেগ ও অনুভূতিগুলিকেই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, এবং যেহেতু তাঁর মানসিকতায় একটি আদর্শ ছিল সহজাত ও প্রবল, সে কারণ বিলাস, জাড্য বা জড়িমায় তিনি আক্রান্ত না হয়ে অসীমের দিকে, অন্তর্দর্শন ও তত্ত্ববিষ্ঠার দিকে তিনি সক্রিয় হয়েছেন, সংস্কার তাগিদে নিজেই নিজের মানসিকতার আকল্প প্রতিফলিত করেছেন সংগীত ও কবিতার মাধ্যমে।

ইদৃশ বহুবিধ ভাবগম্ভীর, তত্ত্বৈশ্বর্যমণ্ডিত কাব্য-সৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে নিজেকে হাল্‌কা করে ছড়া ও ছড়ায় চিঠি লিখতেও বাদ দেননি তারাশঙ্কর। অনেক অনুজ স্নেহের পাত্র ও বন্ধুবান্ধবকে এ ধরণের অনেক চিঠি তিনি লিখেছেন। এখানে তাঁর নাতি ও আমাকে লেখা দুটি ছড়া-জাতীয় লেখার কথা উল্লেখ করেই কবি, গীতিকার ও ছড়া লেখক বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তারাশঙ্করের কথা শেষ করব।

গত পূজার পূর্বে তিনি তাঁর নাতিকে মজা করে ছড়ায় একখানি পত্র লেখেন। উক্ত ছড়ার কয়েকটি মাত্র পঙ্‌ক্তি এখানে তুলে দিচ্ছি। সেই পঙ্‌ক্তিগুলি হ'ল—

'বাচ্চু ভাই—

মামার বাড়ীর আকাশে ভাই বর্ষা নামে সকাল সকাল।
তিস্তা মহানন্দা মিলে ডাক ছড়াচ্ছে সামাল সামাল॥
ওদিকে ভাই মালদা জেলায় ফজলি আমের গন্ধ ওঠে।
যে গন্ধে ভাই রন্টু সেয়ান সুড়সুড়িয়ে গিয়ে জোটে॥
এখানে হায় আধা-বর্ষায় আমরা পচে 'মর মর'।
ভাবছি কখন আকাশ ভেঙে নামবে বৃষ্টি ঝর ঝর॥
টালা পাড়ায় বমবাজীতে প্রাণখানা হয় ওষ্ঠাগত।
ক'দিন পুলিশ হানা দিয়ে ধরলে ছেলে গণ্ডা কত॥'

আর আমাকে পূজার পর একটি পত্রের উত্তরে এক বছর লেখেন—

'বিশু, তোমার শিশু ভাবের তারিফ করি আমি,
এমনই ভাব মনে রেখে কাটাও দিবসযামি।
পূজার পরে তোমার প্রণাম ঠিকই পেয়ে থাকি,
আমার আশিস তোমার তরে তারও আগে রাখি।
ইতি—তোমার তারাশঙ্কর দা'

অনেক সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধব ও বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে এমন অনেক ভালবাসা ও সহৃদয়তার নিদর্শন আমার সংগ্রহে থাকলেও, কবি আমাকে তাঁর আশিসে যে ভাবে ধন্য করে গেছেন, তা কোন দিনই বিস্মৃত হবার নয়।

তারাশঙ্করের সঙ্গে একদিন মানুষ হিসাবে মিশবার সুবিধা পেয়েছিলাম। পরিচয়ের সূত্র 'জলসাঘর'। তখন জানতে পারিনি ছবির প্রতি আকর্ষণ চিত্রকরের পেশাতেও দাবি এনে ফেলবে। খুবই আনন্দের কথা, দলভারীর জন্য শিল্পীরা তাঁকে সাদরেই গ্রহণ করবে তবে গোপনে বাড়িয়ে তোলা সম্পদের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে পরশ্রীকাতর ব্যক্তির আনন্দদায়ক হবে বলে মনে হয় না। নীতিবদ্ধ অঙ্কন পদ্ধতির উপর জুলুমের সম্ভাবনা থাকায় শাস্ত্রবিৎরা যে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই :

তারাশঙ্করের আঁকা ছবি ॥ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

উৎকণ্ঠার প্রধান কারণ ছবির রূপ, যা প্রত্যাশিত প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে গরমিল ঘটিয়েছে। এইখানে বলা ভাল কোন রূপই গুণ বর্জিত নয়। কিন্তু গুণের বিচার নির্ভর করে শিক্ষা বা প্রভাব নিয়ন্ত্রিত রুচির উপর। তথাপি এই জাতীয় বিচারকে সাধারণতঃ ব্যক্তিগত মতের সিদ্ধান্ত বলেই মানা হয়। সুতরাং শিক্ষানুসারে ব্যক্তিগত রুচির প্রভেদ হতে পারে। ছবির রূপ নিজের এলাকায় সুন্দরের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা করার কথা। অথচ সুন্দরেরও সঠিক বিবরণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সবাই যদি অনিশ্চিত তাহলে কিসের জন্য ছবি আঁকা? আমার মতে ছবির মধ্যে প্রধান প্রত্যাশা যা থাকে

তা সুন্দরকে খোঁজার আনন্দ, পাওয়া ক্ষণস্থায়ী সান্ত্বনা। তারাশঙ্কর আনন্দের সন্ধানেই ঘুরেছেন। ছবিতে পরের সম্পদ আত্মসাৎ করার স্পৃহা তাঁহার মধ্যে ছিল না। থাকলে প্রকাশ্যে প্রদর্শনীর আয়োজন হত না।

গুণাগুণের কথায় ফিরে আসি। বিচারের তারতম্যে যে কোন বস্তুকে প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ গুণসম্পন্ন করে নেওয়া চলে। দৃষ্টান্তের প্রয়োজনে শালগ্রাম শিলার রূপকে কাজে লাগাই। শিলার গুণবিচারে একদিকে ভূ-তত্ত্ববিৎ বলেন, বস্তুটি একটি প্রাচীন পাথর। কয়েক কোটি বৎসর পার হয়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গিয়েছে যে পাথরেরও জাত-গোষ্ঠী ইত্যাদি আছে। জড়কেও পংক্তির মর্যাদা দিয়ে পৃথক করা হয়। আরো তত্ত্বকথা শিলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যা জানার প্রয়োজন—উপস্থিত আমাদের নেই। ভিন্ন বিচারের রায় শুনি। বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় পাথরের ইতিহাসে যে সত্য আবিষ্কৃত হল, তাকেই ভক্তের দৃঢ় বিশ্বাস দেবতার রূপ বলে মানল এবং সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল, ভগবানের গুণাগুণ বিচার সাপেক্ষ নয়। দেবতার অস্তিত্ব অনাদিকাল থেকে আছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত মঙ্গলদাতার গুণ নিয়ে থাকবে। ভক্তের অটল বিশ্বাস পাথরকেই এমন গুণ বিশিষ্ট করে তুলল যে গুণকে বিচারাধীন করা চলে না। সুতরাং স্বীকার করতে হয় কোন বস্তুর বাঞ্ছিত গুণ থাক বা না থাক, যা নেই তাকে ধারণার দ্বারা পাওয়া যেতে পারে এবং পাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থাকলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এটাও ঠিক যে মতামতের ভিত্তি যতই যুক্তির দ্বারা শক্ত করা হোক, ভিন্ন মতাবলম্বীর অটল বিশ্বাস যাবতীয় যুক্তিকে টলিয়ে দিতে পারে।

ছবির মূল সম্পদ হল নক্সা। নক্সার জন্ম উচ্ছ্বাস থেকে। উচ্ছ্বাসের প্রেরণা আসে কোন বিশেষ রূপ বা ঘটনা অবলম্বনে। সাহিত্য সৃষ্টির গোড়ার কথাও এক। ব্যক্তিগত শক্তির স্তরভেদ অনুসারে প্রকাশভঙ্গীর প্রভেদ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু উচ্ছ্বাসে আন্তরিকতার অভাব থাকলে ছবিতে বলার কথা বেকার হয়ে যেতে পারে। তারাশঙ্কর এদিক দিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনার কালচর্চায় নামেননি। তিনি যে প্রথায় মনোভাব প্রকাশ করেছেন তা নিতান্তই নিরীহ ও সরল। আধুনিক ঔদ্ধত্যের কোন ইঙ্গিতই তাঁর ছবিতে মাথাখাড়া করে ওঠেনি। অতএব তাঁকে শাসন দ্বারা শাস্ত্রসম্মত রীতি মানাবার চেষ্টা করলে রসানুবোধকেই হত্যা করা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে নতুন আমদানি ছবির আদর্শ চোখের সামনে এসে পড়ল। নতুনের মধ্যেও দলাদলির অভাব নেই। তবে আদর্শ সম্বন্ধে ওরা একমত। —ছবি অবোধ্য না হওয়া পর্যন্ত নিরীহ ক্যানভাসের ছুটি নেই। ওরাও নক্সাকে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু নক্সা পাথরের মতই জড়। দর্শককেই ইচ্ছানুসারে ছবিকে গুণবিশিষ্ট করে নিতে হয়। শিল্পী বলে—ছবি আঁকা সার্থক হল। ছবিতে বোঝার দিক খোলসা করে দিলে কল্পনার জন্য থাকে কি? তারাশঙ্কর নতুন পন্থীদের অনুসরণ করেন নি। তাঁর ছবি দেখলে বোঝা যায় তিনি কি বলতে চেয়েছেন। কতটা বলতে পেরেছেন অথবা কি ভাবে বলা উচিত ছিল, তা নিয়ে জটিল তত্ত্বের গবেষকরা ভাবুন। নতুন পন্থীদের মধ্যে যাঁরা অতীতের সম্পদ নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করেন তাঁরা আবার primitive art এর দোহাই পেড়ে শিশুর সরলতাকে ছবিতে খাটান, ফলে অতিপক্কের ছদ্মবেশী আবরণে যা প্রকাশ হয় তা আত্মপ্রবঞ্চনার নির্ভুল রূপ। তারাশঙ্কর এদিক দিয়ে নিজেকে খাঁটি রেখেছেন। প্রবঞ্চনা তাঁর

ধাতে সয় না। তিনি ছবি এঁকেছেন পীড়িত মনকে সুস্থ করবার জন্য। সুন্দরকে কাছে এনে অসুস্থতার চিন্তাকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য। সুতরাং তাঁর ছবির গুণাগুণ বিচার করতে হলে পরিবেশ, সাময়িক মনের অবস্থা এবং প্রকাশভঙ্গীর অসম্পূর্ণতা মেনে নিয়ে, যতটা রস নিবেদন করতে পেরেছেন ততটুকুই স্বীকৃতি দিতে হবে।

সাহিত্যিক শিল্পী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্যকে শেষ করি। ছবির মোহনশক্তি সাহিত্যিক তারাশঙ্কর ছাড়া দেশ বিদেশে আরো অনেককে আকৃষ্ট করেছে। প্রথমেই মনে আসে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাম। তিনি ছবি আঁকার চেষ্টায় নামলেন, নিজের লেখার কাটাকাটির সূত্র ধরে। কালি দিয়ে লেখা, অমনোনীত শব্দ মুছে ফেলার উপায় না থাকায় তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার জন্য নির্দয় ভাবে হিজিবিজির আঁচড় চালাতেন। রসিকের হাতে কলম, কাটাকুটিকেই মার্জিত হিজিবিজির স্তরে তুলে দিল। কবি হিজিবিজির মধ্যেই ছবি দেখলেন। গুণদানে পারদর্শীরা স্বীকার করে নিল—কবি তাঁর আসন বদলিয়েছেন—এখন তিনি শিল্পী, কোনদিন বিশ্বকবির পরিবর্তে বিশ্বশিল্পীর সম্মান পেলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বিদেশে Somerset Maugham ছবি আঁকতেন; জল, রং, তেল ইত্যাদিতে প্রায় হাত পাকিয়ে ফেলেছিলেন। ছবি আঁকতে গিয়ে ছবিকে এমনই ভালোবাসলেন যে, দক্ষ শিল্পীদের আঁকা ছবি লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করা তাঁর বাতিক হয়ে উঠল। সাহিত্যিক Oscar Wilde সমালোচক Ruskinকে মাথায় তোলার জন্য শিল্পী Turner-এর উপরেই স্থান দিয়ে দিলেন। কলমের জোর ছিল, জবরদস্ত ভাষায় ঘোষণা করলেন—"শিল্পী কি বলতে চেয়েছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার

কোন দরকার নেই। যে গুণ ছবির মধ্যে নেই তারই অভাব পূর্ণ করে দেবার অধিকার সমালোচকের আছে, এটা তার জন্ম-সত্ব। ফলে ছবির যখন স্যায্য দাবির বাইরে উপরে পাওনা হল তখন সে নিজস্ব রূপ বদলিয়ে ছদ্মবেশের আড়ালে সত্যকে কোণঠাসা করে ফেলেছে।"

Bernard Shaw যশস্বী হয়ে ওঠবার আগে ছবি ও সঙ্গীতের সুর সম্বন্ধে সমালোচনা করতেন। তাঁর তীক্ষ্মধার ভাষা অনেক সময় নামকরা শিল্পীরও টনক নড়িয়ে দিত। পৃথিবীর বাছাই করা রূপ ও রসস্রস্টাদের ছবির সংক্রান্তে নাম করতে হল, কারণ ছবি আঁকা বা ছবির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এমন অপকর্ম নয় যে, এককথায় নরকবাসের ভবিষ্যদ্বানী লিখে দেওয়া যায়।

তারাশঙ্করের কোন বিশেষ ছবি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না, কারণ আমি বিশ্বাস করি, রসনার তৃপ্তির জন্য কোন সুস্বাদু আহার বিচার করতে গেলে ভোজনের পরেই ব্যক্তিগত মত নির্ভরশীল হয়। পাক-প্রণালীর ব্যাখ্যা পড়ে মসলার হিসাব পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তাতে ভোজন বিলাসীর তৃপ্তি নেই। শেষ কথা, আমাদের দেশে তারাশঙ্করের মত ভিন্ন সাহিত্যিকরাও যদি ছবির দিকে নেকনজর দেন তাহলে খোলা চোখ বন্ধ করে অন্ধ সাজার ফ্যাসান কিছু কমে, রং ও রেখার দ্বারা রূপ সৃষ্টিতেও যে সাহিত্যের মতই রস থাকতে পারে—তা স্বীকৃতি পায়—দেশে সৌখিন অন্ধের সংখ্যা কমে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জী
(রচনাতালিকাসহ)

বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাভপুর গ্রামে ১৮৯৮ সালে, (বঙ্গাব্দ ১৩০৫) শনিবার ৮ই শ্রাবণ, ইংরেজি ২৪শে জুলাই ব্রাহ্মমুহূর্তে তারাশঙ্করের জন্ম হয়।

পিতার নাম—হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাতার নাম—প্রভাবতী দেবী।

গ্রামের স্কুলেই বাল্যকালের শিক্ষাদীক্ষা সুরু। সাত-আট বছর বয়েস থেকেই ছোট ছোট কবিতা লেখার প্রতি ঝোঁক।

বাংলা ১৩১২ এবং ইংরেজি ১৯০৫ সালে পিতৃবিয়োগ। প্রকৃত তারিখ ৯ই আশ্বিন ১৩১২।

আট বছরের তারাশঙ্কর প্রথম কবিতা শারদীয়া পূজা উপলক্ষে ছাপিয়ে সকলের কাছে উপস্থিত করেন। কবিতার প্রথমে ছিল—'আমাদের পত্ত পড়ে দেখুন।'

> "শারদীয়া পূজা যত নিকটে আইল
> তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।"

১৯১৪ সালে প্রথমবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। পরের বছর, ১৯১৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কলকাতার সেণ্ট জেভিয়াস´ কলেজে ভর্তি হন। বিষয়—আর্টস।

১৯১৬ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্ব-গ্রাম নিবাসী শ্রীমতী উমাশশীর সঙ্গে বিবাহ। স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কলেজ জীবনে ইস্তফা এবং ১৯১৭ সনে অন্তরীণ।

১৯১৮ সালের আশ্বিন মাসে বড় ছেলে সনৎকুমারের জন্ম। স্বদেশী আন্দোলনে অন্তরীণ অবস্থায় ক্ষুব্ধ চিত্তে কাব্যচর্চা শুরু।

১৯২২ সালের কার্তিক মাসে দ্বিতীয় সন্তান সরিৎকুমারের জন্ম। কাব্য চর্চার সঙ্গে গ্রাম্য নাট্যসমাজের সঙ্গে যুক্ত। গান্ধীজীর আদর্শে অসহযোগ আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী।

১৯২৪ সালে বড় মেয়ে গঙ্গার জন্ম।

১৯২৫ সাল, বাংলা ১৩৩২—বীরভূমে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল অধিবেশনে স্বাগত সম্ভাষনের কবিতা রচনা। প্রকৃত পক্ষে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ ও পরিচিতি। এই সম্মেলন উপলক্ষে আরো একটি কবিতা লেখেন, নাম—'নান্নুর পথে', কবিতাটি পরবর্তী সময়ে জলধর সেন সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। এ-ছাড়া আরো একটি কবিতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। 'সচিত্র শিশির' পত্রিকায় ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতাটি প্রকাশিত সময়ের দ্বারা প্রমান করে যে এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। কবিতাটি এখানে তুলে দেওয়া হল—

ঢেউ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মলয় দিতেছে দোল
উজানেতে তটিনীর।
কবি-কর-উজ্জ্বল
চঞ্চল নাচে নীর॥
মাথাগুলি ভাঙ্গা ভাঙ্গা
সোহাগের টানেতে।
যেন সরমের কম্পন—
কিশোরীর গানেতে।

সোনার মলাট

যেন পরীদের বাসরের
　　ঘতি-ঝাড়-লণ্ঠন।
যেন বধুর চকিত আঁখি
　　ভেদি অবগুণ্ঠন॥
বুঝি জলতলে রাজবালা
　　কৌটাটি খুলিয়া॥
অপরূপ মনিটিরে
　　দেখে ধরে তুলিয়া॥
প্রবালের জানলায়
　　রূপ তার ঠিকরে।
এসে পড়ে দুনিয়ায়
　　হাসে চারি—দিকরে॥
প্রিয় কর পরশনে
　　নববধূ কম্পন।
বুঝি সাগর আলিঙ্গনে
　　তটিনীর শিহরণ॥

['সচিত্র শিশির' ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ পৃ ৭৩২। প্রথম প্রকাশিত। এই করিতাটি শ্রীসনৎকুমার গুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

ঐ বছরেই ১৩৩৩ সালে 'পূর্ণিমা' মাসিকপত্রের প্রকাশ ঘটে এবং তারাশঙ্কর এই পত্রিকার সহঃ সম্পাদক হন। এই পত্রিকার আয়ু ছিল এক বছর এবং প্রথম সংখ্যা থেকেই তারাশঙ্করের বিভিন্ন কবিতা ও রচনা স্থান পায়। প্রথম সংখ্যায় 'বন্দী প্রতাপাদিত্য' নামে দীর্ঘ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এ-ছাড়া পূর্ণিমা পত্রিকায় চারটি গল্প, গান, ভ্রমণকাহিনীও প্রকাশিত হয়। 'পূর্ণিমা' ছিল, বীরভূমের আঞ্চলিক পত্রিকা।

সাহিত্যজীবনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ত্রিপত্র', ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন কলকাতার চন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

১৯২৬ সালে মেজ মেয়ে বুলুর জন্ম।

১৯২৭ সাল, বাংলা ১৩৩৪, তারাশঙ্করের প্রথম গল্প 'স্রোতের কুটো' পূর্ণিমা' পত্রিকায় প্রকাশিত। ঐ বছরেই ১৩৩৪ এর ফাল্গুন সংখ্যায় বিখ্যাত 'কল্লোল' পত্রিকায়, তারাশঙ্করের 'রসকলি' গল্প প্রকাশিত এবং সুনাম বৃদ্ধি।

বাংলা ১৩৩৫ এবং ইংরেজি ১৯২৮ সাল থেকে তারাশঙ্কর কবিতা রচনার পরিবর্তে গল্প উপন্যাস রচনার দিকে এগিয়ে গেলেন। 'কল্লোল' পত্রিকাগোষ্ঠির উৎসাহ এর অন্যতম কারণও বলা যেতে পারে।

১৩৩৫-এর বৈশাখ সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায় 'হারাণো সুর' গল্পটি প্রকাশিত হয়। ইংরেজি ১৯২৮ সাল।

'কল্লোল' শ্রাবন সংখ্যায় (১৩৩৫) 'স্থলপদ্ম' গল্প প্রকাশিত হয় এবং 'উপাসনা' পত্রিকার ১৩৩৫-এর ভাদ্র সংখ্যায় 'চোখের ফুল' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'উওরা' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩৩৫-এ 'কুশপুত্তলী' গল্পটি প্রকাশিত হয়।

বাংলা ১৩৩৬, ইংরেজি ১৯২৯ সালে তারাশঙ্করের সাহিত্য সাধনায় বিঘ্ন ঘটে। মূল কারণ স্বদেশী আন্দোলন। এই সময়কালে মাত্র একখানি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল এবং অন্য রচনায় মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়নি। ১৩৩৬-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায় 'রাইকমল' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই গল্পের নামকরণ করেছিলেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৩৩৬-এর শুধু এই গল্পটিই একমাত্র রচনা।

বাংলা ১৩৩৭, ইংরেজি ১৯৩০ সালে তারাশঙ্কর গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান। বন্দীজীবনে স্বাধীনতাকামী দেশসেবীদের মধ্যে মতবিরোধ তাঁর মনকে ক্লিষ্ট ও বেদনায় বিদ্ধ করে। ফলস্বরূপ তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে লেখনীর মাধ্যমে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে লিপ্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যজীবনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন। বন্দীজীবনে বসে 'চৈতালী ঘূর্ণি' ও পাষানপুরী' উপন্যাস লেখা শুরু করেন এবং কয়েকটি গল্প রচনা করেন। ১৯৩১-এর প্রথমে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে, তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'উপাসনা' পত্রিকায়।

বাংলা ১৩৩৭, ইংরেজী ১৯৩১ সালে 'উপাসনা' পত্রিকার মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায় 'মরুর মায়া' গল্পটি প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গেই 'নবশক্তি' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় 'প্রসাদমালা' গল্পটি প্রকাশিত হয়।

বাংলা ১৩৩৮, ইংরেজি ১৯৩১ সালে বোলপুরে একটি ছোট ছাপাখানা খোলেন।

১৩৩৮-এর বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পটি প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ সংখ্যা 'উপাসনা' পত্রিকায় 'বড় বৌ' এবং 'উপাসনা' ফাল্গুন সংখ্যায় 'মালাচন্দন' গল্প প্রকাশিত হয়।

এই সময় ১৩৩৮-এর আশ্বিন মাসে, ইংরেজি ১৯৩১ সালে, তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস 'চৈতালি ঘূর্ণি' প্রকাশিত হয়। সে সময়কার বাংলার তারুণ্যের প্রতীক শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন।

বাংলা ১৩৩৯, ইংরেজি ১৯৩২ সালের গোড়ায় বোলপুরের ছাপাখানা নিয়ে গোলমাল এবং সুভাষচন্দ্রের পরামর্শে তারাশঙ্কর প্রেস তুলে দিয়ে লাভপুরে চলে এলেন। কয়েকমাস পরে তারাশঙ্কর এক বিষম আঘাত পেলেন। ৭ই অগ্রহায়ণ, তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা বুলুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুজনিত আঘাতে জর্জরিত, অন্যদিকে সেই সঙ্গেই ছোট কন্যা বাণীর জন্ম।

ইতিমধ্যে প্রথম উপন্যাস 'চৈতালি ঘূর্ণি' প্রকাশিত হবার পর বাংলা-দেশের সাহিত্য জগতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সুনাম বৃদ্ধি এবং শান্তিনিকেতনে গিয়ে প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ও আশীর্বাদ গ্রহণ! এই বছর থেকেই লেখার জন্য উপার্জন শুরু।

বাংলা ১৩৪০, ইংরেজি ১৯৩৩ বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় 'মেলা' গল্প প্রকাশিত। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা এবং সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে যোগাযোগ। বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'আলো-আঁধারি' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এরপর শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'রাজা, রাণী ও প্রজা', আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' 'খড়্গ', আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় 'শ্মশান বৈরাগ্য', পৌষ সংখ্যা 'উপাসনা'য় 'সর্বনাশী এলোকেশী', মাঘ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে 'শ্মশান ঘাট', মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'ট্যারা' গল্প পরপর প্রকাশিত হয়। এই

সঙ্গে আষাঢ় ১৩৪০, ইংরেজি ১৯৩৩ সালে দ্বিতীয় উপন্যাস 'পাষানপুরী' প্রকাশিত হয় এবং ঐ বছরেই আশ্বিন মাসে তৃতীয় উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ' প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে। এই বছরেই 'অভ্যুদয়' পত্রিকায় অগ্রহায়ন মাস থেকে 'প্রেম ও প্রয়োজন' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'তে সুরু করে।

বাংলা ১৩৪১, ইংরেজী ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাস হল—বৈশাখ সংখ্যা 'শনিবারে চিঠি'তে 'এ্যাও' গল্প, বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে 'জলসাঘর' গল্প, আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে 'শ্রীনাথ ডাক্তার' গল্প, কার্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'ঘাসের ফুল' গল্প, কার্তিক সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে 'মুখুজ্জে মশায়' গল্প, পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'টহলদার' গল্প এবং 'প্রবাসী' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় 'কুলিনের মেয়ে' গল্প যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। ১৩৪১ সালের আশ্বিন মাসে 'রাইকমল' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় এবং উৎসর্গ করেন কবি শ্রীমতী উমা দেবীকে। এই উপন্যাসটি (রাইকমল ও মালাচন্দন) গল্প দুটির পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল। 'রাইকমল' গল্পটি 'কল্লোল' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ এবং 'মালাচন্দন' 'উপাসনা' পত্রিকার ১৩৩৮-এর ফাল্গুনে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা ১৩৪২, ইংরেজি ১৯৩৫-৩৬ সাল। শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'পুত্রেষ্টি' গল্প প্রকাশিত হয় এবং আশ্বিন মাসে শারদীয় আনন্দবাজারে 'তারিনী মাঝি' ও 'দেশ' পত্রিকায় 'রাখাল বাঁড়ুজ্জে' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এরপর যথাক্রমে কার্তিক 'প্রবাসী'তে 'মতিলাল', মাঘ মাসে 'দেশ' পত্রিকা 'মন্থর বিষ' এবং অন্য একটি ছোট পত্রিকায় 'খাজাঞ্চীবাবু', ফাল্গুন 'প্রবাসী'তে 'রঙ্গিনচশমা', চৈত্র মাসে 'দেশ' পত্রিকায় 'কুড়ানো ঘড়ি' গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে এই বছরের আশ্বিন মাসে 'অভ্যুদয়' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত 'প্রেম ও প্রয়োজন' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছিলেন কবিবন্ধু শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে।

বাংলা ১৩৪৩, ইংরেজি ১৯৩৬-৩৭ সাল। এই বছরে তারাশঙ্করের সব চাইতে বেশী গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বছরের প্রথমে বৈশাখ মাসে 'ছলনাময়ী' গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয়া কন্যা বুলুর স্মৃতির

উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এর পর জ্যৈষ্ঠ মাসে 'দেশ' পত্রিকায় 'আধলা ও পয়সা' এবং 'অভ্যুদয়' পত্রিকায় 'বাউল' গল্প প্রকাশিত হয়। আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে 'প্রতিধ্বনি', ভাদ্র সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে 'রঙ্গিন ফাঁস', আশ্বিন মাসে 'দেশ' পত্রিকায় 'চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস', রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে 'ইস্কাপন' এবং শারদীয় আনন্দবাজারে 'সমুদ্র মন্থন' গল্প প্রকাশিত হয়। কার্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'ডাকহরকরা', অগ্রহায়ণ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'রায় বাড়ি' এবং 'বঙ্গশ্রী'তে 'মধুমাস্টার' গল্প প্রকাশিত হয়। পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ'-এ প্রকাশিত হয় 'ব্যাধি' গল্প এবং মাঘ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে 'মাছের কাঁটা' ও 'দেশ' পত্রিকায় 'তপোভঙ্গ' গল্প প্রকাশিত হয়। ফাল্গুন মাসে 'আনন্দবাজার' দোল সংখ্যায় 'ব্যাঘ্রচর্ম' এবং চৈত্র মাসে 'প্রবাসী'তে বিখ্যাত 'অগ্রদানী' গল্প ও 'দেশ' পত্রিকায় 'পণ্ডিত মশাই', 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে 'সমাপ্তি' গল্প প্রকাশিত হয়।

বাংলা ১৩৪৪, ইংরেজী ১৯৩৭-৩৮ সাল। এই বছরের প্রথম তিন মাস কোন রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। শ্রাবণ মাসে 'জলসাঘর' গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, উৎসর্গ দুর্গাশঙ্কর ও পার্বতীশঙ্করকে। ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'মুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং আশ্বিন সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে 'পঞ্চরুদ্র' ও শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' 'প্রতিমা' গল্প প্রকাশিত হয়। আশ্বিন মাসে 'আগুন' উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, উৎসর্গ নিজের পিতৃ-দেবের উদ্দেশ্যে। এই উপন্যাসটি 'দেশ' পত্রিকায় 'বহ্নি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। কার্তিক সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে 'তিনশূন্য' এবং 'প্রবাসী'তে 'রাজপুত্র' গল্প প্রকাশিত হয়। অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠিতে' 'সন্তান'। মাঘ মাসে 'দেশ' পত্রিকায় 'ইতিহাস' এবং চৈত্র সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে 'হোলি' গল্প প্রকাশিত হয়।

বাংলা ১৩৪৫, ইংরেজি ১৯৩৮-৩৯ সাল। এই বছর বৈশাখ মাসের শেষে 'রসকলি' গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'রসকলি' গল্প গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এই মাসেই 'প্রবাসী'তে 'চৌকিদার', 'শনিবারের চিঠি'তে 'রাজসাপ' গল্প প্রকাশিত হয়। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে 'রাঠোর ও চন্দ্রাবৎ' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং আষাঢ় সংখ্যা 'পরিচয়'-এ 'মা' ও

'প্রবাসী'তে 'সংসার' গল্প প্রকাশিত হয়। আশ্বিন মাসে একসঙ্গে ছয়টি বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প প্রকাশিত হয় এবং দারুণ চাঞ্চল্য পড়ে। আশ্বিন মাসে 'দেশ' পত্রিকায় 'কাঁটা', 'প্রবাসী'তে 'না' 'শনিবারের চিঠি'তে 'মালাকার', শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' 'রাধারাণী', 'কালিকলম'-এ 'শশ্মানের পথে' এবং 'দেশ' পত্রিকায় 'সাবিত্রী চুড়ি' গল্প প্রকাশিত হয়। এই ঘটনা বাংলা কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম। অগ্রহায়ণ মাসে 'অলকা' পত্রিকায় 'শাপমোচন' গল্প এবং মাঘ মাসে 'বঙ্গশ্রী'তে 'ছলনাময়ী' গল্প প্রকাশিত হয়। এই বছরে আর কোন রচনা প্রকাশিত হয়নি।

বাংলা ১৩৪৬, ইংরেজি ১৯৩৯-৪০ সাল। এই বছরের বৈশাখ মাস হ'তে লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'কালিন্দী' 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'তে সুরু করে। এই উপন্যাসের জন্য সারা বছরে গল্প ও অন্য রচনাও' খুব কম প্রকাশিত হয়েছিল। মাত্র পাঁচটি গল্প সারা বছরে লিখেছিলেন। আশ্বিন সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে 'ট্রি-ট্রি' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং 'অলকা' পত্রিকায় 'দেবাঃ ন জানন্তি' গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। কার্তিক মাসে 'বৈজয়ন্তী' পত্রিকায় 'চোরের মা','প্রবাসী'তে 'পিতাপুত্র' এবং 'শনিবারের চিঠি'তে 'বেদেনী গল্প প্রকাশিত হয়। এই বছরে আর কোন গল্প প্রকাশিত হয়নি। আশ্বিন মাসে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়, উৎসর্গ করা হয়েছিল মা ও পিসীমাকে।

বাংলা ১৩৪৭, ইংরেজি ১৯৪০-৪১ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কাল। এই সময় তারাশঙ্কর কলকাতার আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে (১।১) একটি ভাড়া বাড়িতে লাভপুর থেকে সপরিবারে চলে আসেন। লেখক হিসেবে যশ ও অর্থের আনুকূল্য এবং একক ভাবে কলকাতায় থাকার অসুবিধার জন্যই তিনি কলকাতায় সংসার-জীবন শুরু করেন।

আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'ডাইনী' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং ভাদ্র মাসে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'রাঙাদিদি' গল্প। এই ভাদ্র মাসে তাঁর বিখ্যাত 'কালিন্দী' উপন্যাস গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয় এবং উৎসর্গ করেন বন্ধুবর শ্রী সজনীকান্ত দাস মহাশয়কে। আশ্বিন মাসে একসঙ্গে চারটি গল্প প্রকাশিত হয়। 'দেশ' পত্রিকায়-'চন্দ্র জামাইয়ের জীবনকথা', 'শনিবারের চিঠি'তে 'দিল্লীকা

পাজ্ড্', 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় 'পিঞ্জর' এবং শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'বন্দিনী কমলা' গল্প প্রকাশিত হয়। কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয় দুটি গল্প ও একটি উপন্যাস। 'শনিবারের চিঠি'তে 'একরাত্রি', 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'চোরের পূণ্য' গল্প দুটি এবং 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় 'কবি' উপন্যাস।

বাংলা ১৩৪৮, ইংরেজি ১৯৪১-৪২ সাল। এই বছরের প্রথমদিকে আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের ঠিকানা থেকে বাসা পরিবর্তন করেন। এবার তিনি কাশী-নাথ দত্ত রোড, বরানগরে নতুন ভাড়া বাড়িতে উঠে আসেন। এই বছরের প্রথমেই 'কালিন্দী'র নাট্যরূপ তৎকালীন নাট্য-নিকেতন মঞ্চে অভিনীত হয়। বৈশাখ মাসে 'তিনশূন্য' নামে গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং এই গল্পগ্রন্থে 'সুখনীড়', 'চারহাটির স্টেশন মাষ্টার' ইত্যাদি গল্পগুলি ছিল। ঐ মাসেই 'প্রবাসী'তে 'হরিপণ্ডিতের কাহিনী' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং এর পর পূজো পর্যন্ত নতুন কোন গল্প প্রকাশিত হয়নি। এই সময়ে 'কালিন্দী' উপন্যাসের নাট্যরূপ বই আকারে প্রকাশিত হয় শ্রাবণ মাসে। আশ্বিন মাসে শারদীয় আনন্দবাজারে 'যাদুকরী' গল্প প্রকাশিত হয় এবং কার্তিক মাসের'শনিবারের চিঠি'তে 'সনাতন' গল্পটি ও 'প্রবাসী'তে 'প্রত্যাবর্তন' গল্প প্রকাশিত হয়। এর পর চৈত্র মাস পর্যন্ত আর কোন গল্প, উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি।

বাংলা ১৩৪৯, ইংরেজী ১৯৪২-৪৩ সাল। জ্যৈষ্ঠ মাসে বীরভূম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন অতুল চন্দ্র গুপ্ত। কিছুদিন পর পুনরায় বাসা পরিবর্তন করে আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে ফিরে আসেন।

বৈশাখের শেষে বড় কন্যা গঙ্গা দেবীর বিবাহ হয় শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আষাঢ় মাসে 'দুই পুরুষ' নাটক প্রকাশিত হয়। এর পর প্রকাশিত হয় বিখ্যাত 'গণদেবতা' উপন্যাস আশ্বিন মাসে। উৎসর্গ করেন শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরীরকে। আশ্বিন মাসের শনিবারের চিঠিতে 'শ্যামাদাসের মৃত্যু' গল্পটি প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে কলকাতায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘটা চলছে, জাপানী বোমার ভয় সকলকে ঘিরে। কলকাতায় এ্যান্টি ফ্যাসিষ্ট রাইটার্স এ্যাণ্ড আর্টিষ্টস

এসোসিয়েশন গড়ে উঠেছে। তারাশঙ্কর এই সংস্থার সভাপতি হলেন পৌষ মাসে। তিনি ছিলেন তৃতীয় সভাপতি। পূর্ববর্তী দুজন হলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত। এই পৌষ মাসেই কলকাতায় জাপানীরা বোমা ফেললো, এবং একটা পলায়নী মনোভাব লোকের মনে এল। তারাশঙ্কর ছেলে মেয়েদের নিয়ে ডিসেম্বর মাসে লাভপুর চলে গেলেন। ফাল্গুন মাসে 'পথের ডাক' নাটক প্রকাশিত। উৎসর্গ শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। চৈত্র মাসে 'পুরোহিত' 'রাঙ্গুর বিবাহ' ইত্যাদি গল্পগুলি নিয়ে 'প্রতিধ্বনি' গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

বাংলা ১৩৫০, ইংরেজি ১৯৪৩-৪৪ সাল। যুদ্ধজনিত ক্ষুব্ধ মানসিকতায় এই বছরের প্রথমদিকে কোন রচনাই প্রকাশিত হয়নি। আশ্বিন মাসে শারদীয় উপলক্ষে বেশ কয়েকটি গল্প উপন্যাস, একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আশ্বিন মাসে শারদীয় 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় 'মন্বন্তর' উপন্যার এবং শারদীয় 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'ময়দানব' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই মাসেই 'বেদেনী' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, উৎসর্গ করেন শ্রীনির্মলকুমার বসুকে। আশ্বিন মাসে 'দিগন্ত' পত্রিকায় 'মরা মাটি' গল্প প্রকাশিত হয়। কার্তিক মাসে 'শনিবারের চিঠি'তে 'অহেতুক' গল্প প্রকাশিত হয় এবং 'দিল্লীকা লাড্ডু' গল্পগ্রন্থটি একই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। মাঘ মাসে 'মন্বন্তর' উপন্যাস বই আকারে প্রকাশিত হয় এবং উৎসর্গ করেন 'বনফুল'কে। এই মাসেই 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসও প্রকাশিত হয়েছিল, উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ফাল্গুন মাসে একটি উপন্যাস ও দুটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'যাদুকরী' ও 'স্থলপদ্ম'। প্রথমটি শ্রীশিশির মল্লিককে এবং দ্বিতীয়টি ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যকে উৎসর্গ করেন। 'কবি' উপন্যাস আকারে এই মাসেই প্রকাশিত হয় এবং উৎসর্গ করেন শ্রীমোহিতলাল মজুমদারকে।

বাংলা ১৩৫১, ইংরেজি ১৯৪৪-৪৫ সাল। এই বছরের প্রথম দিকে দেখা যাচ্ছে লেখকের কোন গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তখন অন্তিমকাল, তথাপি যে কোন কারণেই হোক লেখক তারাশঙ্কর এই সময়টায় কিছু লেখেননি। আশ্বিন মাসে পূজোর সময় তিনটি গল্প প্রকাশিত হয়। শারদীয় আনন্দবাজারে 'বোবাকান্না', শনিবারের চিঠিতে 'শেষকথা'

এবং যুগান্তরে 'পৌষলক্ষ্মী' এই তিনটি গল্প প্রকাশিত হয়। অগ্রহায়নে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয় 'আখেরী' গল্পটি। এই মাসেই '১৩৫০' গল্প-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং উৎসর্গ করেন মহাত্মা গান্ধীকে। মাঘ মাসে প্রকাশিত হয় 'বিংশশতাব্দী' নাটক গ্রন্থ। এই মাসেই কানপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি হন।

বাংলা ১৩৫২, ইংরেজি ১৯৪৫-৪৬ সাল। বৈশাখ মাসে নববর্ষ সংখ্যা 'দৈনিক বসুমতী'তে 'তমসা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে 'চকমকি' প্রহসন-মূলক গল্পের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আষাঢ় মাসে 'দ্বীপান্তর' নাট্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং উৎসর্গ করেন শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে। শ্রাবণ মাসে 'প্রসাদমালা' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই তিন মাসে কোন গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। আশ্বিন মাসে বেশ কয়েকটি গল্প পূজোর ফসল রূপে প্রকাশিত হয়। শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ইমারৎ', শনিবারের চিঠিতে 'কান্না', সোনার বাংলায় 'তৃষ্ণা' এবং কলরবে 'কাকপণ্ডিত' গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। অগ্রহায়ণ মাসে 'হারানো সুর' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং উৎসর্গ করেন শ্রীসুবল বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মাঘ মাসে একমাত্র উপন্যাস 'সন্দীপন পাঠশালা' প্রকাশিত হয়েছিল, উৎসর্গ করেন শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীকে। বছরের শেষে চৈত্র মাসে 'দিগন্ত' পত্রিকায় 'শবরী' গল্পটি প্রকাশিত হয়।

বাংলা ১৩৫৩, ইংরেজি ১৯৪৬-৪৭ সাল। কলকাতার দাঙ্গা ও দেশের অস্থির অবস্থা লেখককে বিষাদগ্রস্থ করেছিল, যে কারণে প্রথমদিকে কোন রচনা প্রকাশিত হয়নি। আশ্বিন মাসে শারদীয় 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় বিখ্যাত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি লেখেন। এই সঙ্গে 'কথাশিল্প' পত্রিকায় 'কামধেনু' গল্পটি প্রকাশিত হয়। অগ্রাহয়ণ মাসে প্রকাশিত হয় 'ঝড় ও ঝরাপাতা' উপন্যাস বই আকারে। উৎসর্গ শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। পৌষ মাসে প্রকাশিত হয় 'অভিযান' উপন্যাস এবং উৎসর্গ করেন শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মাঘ মাসে প্রকাশিত হয় 'ইমারৎ' গল্পগ্রন্থ। উৎসর্গ করেন শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ঐ বছর ফাল্গুন মাসে ছোট ছেলে সরিৎকুমারের বিবাহ দেন এবং মোটর গাড়ী কেনেন।

বাংলা ১৩৫৪, ইংরেজি ১৯৪৭-৪৮ সাল। দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও অন্যান্য কারণে এই বছরটি লেখকের জীবনে উল্লেখযোগ্য। এই বছরেই তিনি টালা পার্কে জমি কেনেন নিজের বাড়ির জন্য এবং বাড়ির কাজ শুরু করেন। পঞ্চাশ বছরে পদার্পন উপলক্ষে বাংলাদেশের সাহিত্যিককুল দ্বারা সম্বর্ধিত হন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁর সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ 'শরৎস্মৃতি স্বর্ণপদক' দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বছরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতায় সম্মেলনের উদবোধন করেন এবং বোম্বাইতে সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন।

বছরের প্রথমে বৈশাখ মাসে 'গল্প ভারতী' পত্রিকায় 'পাটনী' গল্প প্রকাশিত হয় এবং 'রামধনু' গল্পগ্রন্থটিও একই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বছর তিনি কোন শারদীয় সংখ্যায় লেখেন নি এবং পৌষ মাসে "তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। মাঘ মাসে প্রকাশিত হয় 'শ্রীপঞ্চমী' গল্পগ্রন্থটি এবং শবিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয়েছিল 'মহাপ্রস্থান উপাখ্যান গল্পটি। ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয় 'সন্দীপন পাঠশালা'র কিশোর সংস্করণ উপন্যাস। চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয় বছরের শেষ উপন্যাস 'তামস তপস্যা।'

বাংলা ১৩৫৫, ইংরেজি ১৯৪৮-৪৯ সাল। এই বছরের প্রথম দিকে টালা পার্কের বাড়ি নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকেন এবং রথের দিন টালা পার্কের নিজের বাড়িতে গৃহপ্রবেশ হলো। এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কয়েকটি গল্প তিনি লিখেছিলেন। ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'কামধেনু' গল্পগ্রন্থে এই সব গল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই গল্পগ্রন্থে তিনি কলকাতার দাঙ্গার স্মৃতি নিয়ে একখানি গল্প লিখেছিলেন। আশ্বিন মাসে শুধুমাত্র 'ছায়াপথ' পত্রিকায় 'গবিন সিংহের ঘোড়া' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। মোটামুটিভাবে এই বছরটি নতুন রচনা সৃষ্টির বিষয়ে বন্ধ্যা ছিল। পুজোর ঠিক পরেই তিনি বৈদ্যনাথধাম যান বেড়াতে এবং ফেরার পথে লাভপুরে জন সম্বর্ধনা লাভ করেন। কলকাতায় ফিরে তাঁর জীবনের এক দুঃখবহ ও অপমানকর ঘটনা ঘটে। 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসটির ছায়াছবি মুক্তিলাভ করে। এই ছবিটির বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু মানুষের ক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ পায়। ২৭শে

চৈত্র তারাশঙ্কর হাওড়া সেবা সঙ্ঘের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে ফিরছিলেন এবং ফেরার পথে কিছু লোকের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হয়েছিলেন। এই ঘটনাটি নানাভাবে তাঁকে ক্লিষ্ট করেছিল এবং দীর্ঘদিন তিনি ভুলতে পারেননি।

বাংলা ১৩৫৬, ইংরেজি ১৯৪৯-৫০ সাল। এই বছরটি লেখক তারাশঙ্করের সৃষ্টির দিকে একেবারে গভীর শূন্যতায় বিরাজ করছে। মাত্র দুটি গল্প সারা বছরে প্রকাশিত হয়েছিল এবং কোন বই প্রকাশিত হয়নি। এর সঠিক কোন কারণ পাওয়া যায়নি। একমাত্র পূজোর সময় আশ্বিন মাসে শারদীয় 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'মাটি' গল্পটি এবং 'শনিবারের চিঠি'তে 'বেদের মেয়ে' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এ-ছাড়া আর কোন গল্প বা উপন্যাসের খবর ছিল না।

বাংলা ১৩৫৭, ইংরেজি ১৯৫০-৫১ সাল। পূর্ববর্তী বছরের শূন্যতা এই বছরে সর্বদিকে পূর্ণতা পায়। অথবা বলা চলে, এই বছরের যাবতীয় প্রকাশিত রচনা আগের বছর থেকেই লেখা শুরু হয়েছিল। বছরের প্রথমে বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় 'পদচিহ্ন' উপন্যাস, উৎসর্গ প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। তারপর প্রকাশিত হয় 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'। জ্যৈষ্ঠ মাসে লেখকের ধাত্রীদেবতা পিসীমা পরলোকগমন করেন। আষাঢ় মাসে একসঙ্গে দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটি হল 'উত্তরায়ণ', উৎসর্গ প্রবোধকুমার সান্যাল এবং দ্বিতীয়টি হল 'মহাশ্বেতা'। আশ্বিন মাসে 'শনিবারের চিঠি'তে 'রাধা' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং কার্তিক মাসে 'মাটি' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পগ্রন্থে 'ময়দান', 'গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী' ও অন্যান্য গল্পগুলি সংকলিত ছিল। পরের কয় মাসে কোন গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি।

বাংলা ১৩৫৮, ইংরেজি ১৯৫১-৫২ সাল। বৈশাখ মাসের 'মৌচাক' পত্রিকায় 'ডাইনী' গল্পটি প্রকাশিত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয় 'আমার কালের কথা' (আত্মজীবনীমূলক রচনা), উৎসর্গ করেছিলেন একসঙ্গে চারজনকে—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ

চক্রবর্তী এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে। শ্রাবণ মাসে 'যুগ বিপ্লব' নাট্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং আশ্বিন মাসে শারদীয় 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হয়েছিল 'শিলাসন' গল্পটি। মাঘ মাসে 'শিলাসন' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, উৎসর্গ করেছিলেন প্রমথনাথ বিশীকে। এই বছরের শেষে তিনি বিধান পরিষদের মনোনীত সদস্যপদ লাভ করেন।

বাংলা ১৩৫৯, ইংরেজি ১৯৫২-৫৩ সাল। এই বছরে সাধারণভাবে ছোট গল্প প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু তিনখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি উপন্যাস ও একটি স্মৃতি কাহিনী। আশ্বিন মাসে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় এবং উৎসর্গ করেন নারায়ণ চৌধুরী, সন্তোষ কুমার ঘোষ এবং অনিল চক্রবর্তীকে। বছরের শেষে চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয় 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাস এবং 'বিচিত্র স্মৃতি কাহিনী' বই দুটি। 'আরোগ্য নিকেতন' উৎসর্গ করেন মনোজ বসুকে।

বাংলা ১৩৬০, ইংরেজি ১৯৫৩-৫৪ সাল। শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয় 'আমার সাহিত্য জীবন', (আত্মজীবনী) প্রথম খণ্ড, উৎসর্গ করেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে। আশ্বিন মাসে 'পরশমণি' পত্রিকায় 'বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাহিনী' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয় 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় গল্প' বইটি। বছরের শেষে প্রকাশিত হয় 'না' উপন্যাসটি।

বাংলা ১৩৬১ ইংরেজি ১৯৫৪-৫৫ সাল। বছরের ৮ই মেই কালীমন্ত্রে দীক্ষা নেন। শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয় 'চাপা ডাঙ্গার বৌ' উপন্যাসটি এবং 'স্বনির্বাচিত গল্প' সংকলন। আশ্বিন মাসে 'ইন্দ্রধনু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'হেডমাস্টার' গল্পটি। 'স্বর্গমর্ত' গল্পটিও এই মাসেই প্রকাশিত হয়েছিলপৌষ। মাসে প্রকাশিত হয় 'গল্প সঞ্চয়ন' গ্রন্থটি।

বাংলা ১৩৬২, ইংরেজি ১৯৫৫-৫৬ সাল। এই বছরটি লেখকের জীবনে স্মরণীয়। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার লাভ। এই বছরেই চীনা লেখক লু-স্যুনের জয়ন্তী উপলক্ষে ভারত সরকার

কর্তৃক সাহিত্যিক প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়ে চীন রওনা হন। কিন্তু অসুস্থতা হেতু রেঙ্গুন থেকে প্রত্যাবর্তন। এই কারণে এই বছরে রচনার সংখ্যা খুবই কম। মাত্র একটি গল্প ও একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত। বৈশাখ মাসের 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকায় 'জন্মান্তর' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে 'বিস্ফোরণ' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'বিস্ফোরণ' গল্পগ্রন্থে 'একটি মুহূর্ত', 'জটায়ু', 'বিস্ফোরণ', 'কালোমেয়ে', 'আফজল খেলোয়াড়ী' ও 'রমজান শের আলি' গল্পগুলো সংকলিত হয়েছিল।

বাংলা ১৩৬৩, ইংরেজি ১৯৫৬-৫৭ সাল। এই বছরটিও পূর্ববর্তী বছরকে অনুসরণ করেছে। ভারত সরকারের সাহিত্য একাডেমীর পুরস্কার লাভ। এই বছর পুনরায় চীন সরকারের আমন্ত্রণে সাংস্কৃতিক ভ্রমণ উপলক্ষে চীন গমন। শ্রাবণ মাসে 'শনিবারের চিঠি'তে, 'আকালের কাহিনী' গল্প প্রকাশিত এবং এই মাসেই 'কৈশোর স্মৃতি' (আত্মজীবনী) প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ—লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ভাদ্র মাসে 'পঞ্চপুত্তলী' উপন্যাস প্রকাশিত হয় এবং 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' গন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই মাসেই 'কালান্তর' গল্পগ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় এবং আশ্বিন মাসে 'জয়যাত্রা' পত্রিকায় 'কমল মাঝি' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। ফাল্গুন মাসে 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র দোলসংখ্যায় 'সুরতহাল রিপোর্ট' গল্পটি প্রকাশিত হয়।

বাংলা ১৩৬৪, ইংরেজি ১৯৫৭-৫৮ সাল। এই বছরে এশীয় লেখক সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটিতে যোগদানের জন্য মস্কো গমন। ভারতীয় লেখক প্রতিনিধি দলের নেতারূপে তাসকন্দে এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগদান। এই বছরে উপন্যাসের সংখ্যাও সর্বাধিক। আষাঢ় মাসে 'কবি' নাটকরূপে প্রকাশিত এবং উৎসর্গ করেন স্বর্গীয় মোহিত লাল মজুমদারের স্মরণে। শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয় 'বিচারক' উপন্যাসটি, উৎসর্গ করেন শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয়কে। শ্রাবণ মাসে ছোট মেয়ে বাণীর বিবাহ হয়। আশ্বিন মাসে 'কালরাত্রি' নাটক বই আকারে মহালয়ার দিন প্রকাশিত হয়। অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয় 'বিষপাথর' গল্পগ্রন্থটি এবং পৌষ মাসে 'সপ্তপদী' উপন্যাস। মাঘ মাসে 'বিপাশা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়, উৎসর্গ

রমাপদ চৌধুরীকে। বছরের শেষ উপন্যাস 'রাধা' চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয় এবং উৎসর্গ করেন প্রেমেন্দ্র মিত্রকে।